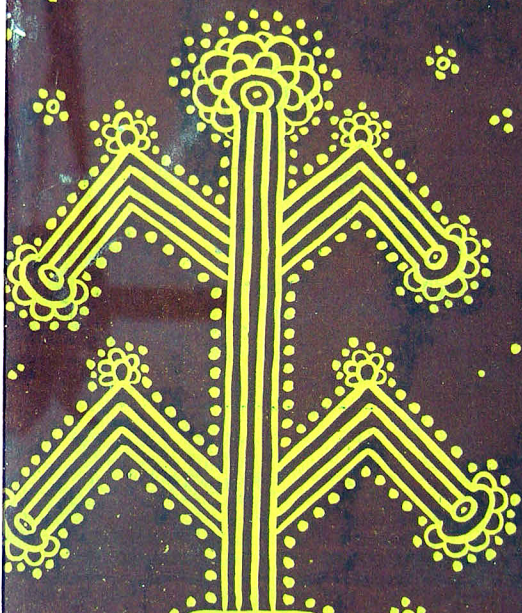


**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**  
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : <i>গাবেশানা ১০২ তামেরলান্দ রাস্তা, কলকাতা-৭০০০০৯</i>
Collection : KLMLGK	Publisher : <i>১৯৫০</i>
Title: <i>কবিতা</i> (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : <div style="margin-left: 100px;">18/4</div> <div style="margin-left: 100px;">20/1</div> <div style="margin-left: 100px;">20/2</div> <div style="margin-left: 100px;">20/4</div> <div style="margin-left: 100px;">21/1</div>	<div> Year of Publication :  <div style="margin-left: 100px;">Aug 1954</div> <div style="margin-left: 100px;">Sep 1955</div> <div style="margin-left: 100px;">Dec 1955</div> <div style="margin-left: 100px;">June 1956</div> <div style="margin-left: 100px;">Sep 1956</div> </div>
	Condition : <input checked="" type="checkbox"/> Brittle / <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor : <i>মে ১৭/৫৬</i>	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

# কবিডা



সম্পাদক

বুদ্ধদেব বসু



আদ্বৈত ১৩৬৩





লক্ষ্মী ঘি'য়ে  
লক্ষ্মীশ্রী

॥ লক্ষ্মীদাস প্রেস প্রিন্ট কর্তৃক ॥



## কবিতা

বার্ষিক সূচীপত্র

বিশেষ বর্ষ : আশ্বিন ১৩৬২—আষাঢ় ১৩৬৩

## কবিতা

অমিয় চক্রবর্তী

গান

- |   |     |
|---|-----|
| ১ 'ভালোবাসার বদলে আর'                         | ৬৭  |
| ২ 'কেউ বা আলো কেউ বা আশ্রন'                   | ৬৭  |
| ছই ছন্দে : 'অদর্শনের হৃৎকেন্দ্র তাকেও তো দাও' | ১৬৪ |
| মৃত্যু : 'অন্তে দেখে দরজা খোলা'               | ১৬৫ |
| সাতটা মারিমা ধীরে                             | ১৯৮ |
| আন্তর্জাতিক : 'টোম্যাটোর লাল রস'              | ২৭৭ |
| কাইরোর ভোরে : 'আকাশ-বাড়ীয়ে দেখি'            | ২৮০ |

অর্চন দাশগুপ্ত

- |  |     |
|--|-----|
| একটি ছবি : 'জানালার থেকে দেখা'                     | ১৩৮ |
| স্বরজ কুণ্ড : 'লেবুর খোসার মতো অমৃৎ মাটির দেয়ালে' | ২৪৭ |
| রিজ-এ : 'রিজ-এর গুপারে সারাদিন গুয়া'              | ২৪৭ |
| দিগ্ভার দৃশ্য : 'টু গিটারে বড়'                    | ৩৩৫ |

অশোকবিজয় রাহা

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| জুলতা : 'লক্ষীটি, শোনা,' | ৩০৯ |
|--------------------------|-----|

আবুল কাশেম রহিম উদ্দীন

- |  |     |
|--|-----|
| মঞ্জলী : 'নামের দক্ষিণ তটে যে-শব্দের মন্দির বিজ্ঞাস' | ১৪১ |
| যখন তাকেই দেখি : 'বিশ্বয়ে অবাক হই'                  | ২৪৩ |
| সত্য নয় পার্বত্য : 'নিশি-পাওয়া ঘরে আশার জোনাকি'    | ২৪৪ |

আরতি আচার্য চৌধুরী

- |   |    |
|---|----|
| সন্ধ্যা যখন নামলো : 'ভয়ী সন্ধ্যা পরলো' | ৩৫ |
|---|----|

## আল মাহমুদ

প্রবেশ : 'সত্যই অসম্ভব হই যাম আরে তত'	২১৯
অন্ধকারে একদিন : 'একদিন যবে এক'	২১৯
সিফানি : 'ডেবেছি তো অন্ধকারে আমি'	২২০

## ঐশ্বর আলি

সাহস : 'ছোট পাখিটিও ছড়িয়েছে ডানা'	২০৯
-------------------------------------	-----

## কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

উড়ো তর্ক : 'তবে শোন বলি তোরে'	৪২
একটি মহুর্তের উক্তি : 'আমার নির্ভর জুঁমি'	১৪৬
সময় : 'সময়, তোমাকে আমি কী বলে যে'	২৮৮
উৎকর্ষা : 'অল্প কেউ যদি থাকে তার কাছে'	২৮৮

## গোপাল ভৌমিক

সে মেয়ে : 'ছুটি ছন্দয়ের সেজুবন্ধন পেরিয়ে'	৪১
--	----

## গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

* দিশারী : 'তাকে আমি দৃষ্টি দেবো'	১৪৮
স্বপ্ন : 'বিকচ পদ্মের পাগড়ি ছিঁড়ে চের'	১০৯

## জীবনানন্দ দাশ

ছুটি কবিতা	
------------	--

১ 'পড়ে গেল একেবারে আমারি ছায়ার কাছে—যাসে'	২৬৪
২ 'বরষা নতুন এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে'	২৬৪

## জ্যোতির্ময় দত্ত

রূপের পুতুল : 'তার রূপের পাখি স্রবের হ'লো না'	৬১
আচাচুয়া পাখি : 'আমার রূপের আশার হ'লো'	১১৯
উদ্ভিদ-সাগর : 'প্রাণ্ডার আচম্কা আটকে গেলো'	১২১
এশুক যন্ত্রণা ছিঁড়ের মতো : 'চড়াই, চিরিপিক'	২৪০

## কুর্গাদাস সরকার

পূর্বরাগ : 'হবেলা ছন্দ দেবি'	৩০৮
------------------------------	-----

## নমিতা মুখোপাধ্যায়

মধুর বিস্মৃতি : 'স্বপ্নের পোঁস আর স্বপ্নেরতর মাখে'	২১৪
--	-----

## নরেশ গুহ

একটা নষ্ট ফল : 'আহা রে তুই কে ফল অকালে'	১০৪
---	-----

## পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

প্রস্তাব : 'জেনো নুনোপথ বন্ধ'	১৪৭
অষ্টমায়িক : 'অন্ধের কাঁচা ছেলে'	২১৬
এবার গেলে কিরবে সোমন : 'যাওয়ার যা তা যাবেই'	২১৮
একটি অমৃতত্ব : 'পৌরসমিতির ডোম'	২১৮

## প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

ভিলানেল : 'তোমার ভালোবাসা ভোরের কথাকলি'	৩০৫
---	-----

## প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

আবহমান : 'যখন বর্ণন স্রব তোমার শরীরে'	২০৬
জানলা : 'দূরের খাদে তারার কুয়াশা'	৩৩৭
লষ্ট প্রেম : 'সে-এসে দাঁড়ায় নুনি আকাশের মতো'	৩৩৭

## প্রতিমা পাল

বিকেল : 'নীল বিকেল'	৩৯
রাজিশেষ : 'বাইরে নেমেছে বৃষ্টি'	৩৯
একটি স্বপ্ন : 'কাল রাতে, হঠাৎ আমার'	১৩৯

## প্রভাকর সেন

প্রমিতি : 'কোমল পাতার আভা এল্লের মাখে'	২৪৬
--	-----

## বিকাশ দাশ

অলৌকিক : 'পুরোনো শড়ক, এর অলিগলি'	২১৩
-----------------------------------	-----

## বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

হাসি তবু হ'লো ইতিহাস : 'যে-হাসি ছিটিয়ে দিয়ে'	১২৭
মালাদেব গান : 'হিঁমোলেট গুহ'	২০১
জীবনকান্ত : 'মৃত্যু, জল, অগ্নি ও বায়ু'	২০৩
র'দেল-পঞ্চক : 'রাজি আর নয় স্রব্দ'	২৬৮



বিশ্ব দে	৬৬
চতুর্থশপদী : 'বহুদীর্ঘ পরিক্রমা'	১১৩
সাতটি এপিগ্রাম	১০০
স্বরের আড়ালে স্রুতি : 'আমার বাহতে তর দিয়েও'	২৩১
দশমিক : 'কর্ষে আর ব্যক্তির প্রত্যাহ'	
বুদ্ধদেব বহু	
সনেটগুচ্ছ :	১৭
কেন : 'এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি'	১৭
কবি : তার ক্ষমতার প্রতি	১৮
সনাতন সংঘর্ষ : 'বাসনা অপরিণীম্য'	১৯
'চুই পাখি' : 'যখন রাত্রি নামে'	২০
মিল ও ছন্দ : 'মানি, এক অন্তর্গামী'	২০
নেশা : 'মাতাল, মাতাল হও'	২১
কর্কটক্রান্তি : 'দীর্ঘ দিন শেষ হ'লো'	২২
অপেক্ষা : 'উল্লোল দিনের পর দিন'	
না-লেখা কবিতার প্রতি :	২২
১ : অনন্ত জন্মের দ্বার	১০০
২ : তোমরা, আমাকে যারা	১০০
৩ : পরমা ?...জানে না কেউ	১০১
স্টিল-লাইক : 'সোনালি আপেল, তুমি'	১০২
প্রেমিকারা : 'মেয়েদের হাসির প্রশ্রবণ'	১০২
স্বপ্নের উত্তরে : 'শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন'	১০৩
মধ্যসমুদ্রে : 'বলো, কিছু বলো'	১০৪
প্যাণ্ডরোপ : 'ওরা সব নিয়েছিলো ভাগ ক'রে'	
আটচাল্লিশের শীতের জুত	১৬৬
১ : 'না তুই, নিবি না আর'	১৬৭
২ : 'প্রান্তরে কিছুই নেই'	১৬৮
৩ : 'কবে সেই তুচ্ছান দুরলো'	

# দেবযানীর স্বপ্নে কচ

১ : 'মাবো-মাবে, বার-বার,'	২৪৯
২ : 'তোমার কথা ভাবতে গিয়ে'	২৫০
৩ : 'ভুলেও করি না উচ্চারণ'	২৫১
প্রেমিকের গান	
১ : 'কী এসে যায়, হও না তুমি হৃদয়হীনা'	৩০৯
২ : 'কাছে যাওয়া বজ্ঞ বেশি হবে'	৩৩৯
এক তরুণ কবিকে : 'পাঞ্জাবিতে ইন্ড্রি রেখে কড়া'	৩৪১
মোহিত চট্টোপাধ্যায়	
চেনা পাখি : 'স্বর্ষের হাতে সোনার পদে'	১২৯
মৃণালকান্তি	
প্রতীক্ষা : 'সে আসেনি'	৫৭
পাছ : 'ক্লান্তিকর রুদ্ধ দিন'	৫৭
অন্ধ : 'কী যে শান্তি নীলিমার'	৫৮
অসহায় : 'রৌত্র রঙ মেঘ পাখি'	২৬৬
নিঃশ্ব : 'একটি মুহূর্ত শুধু'	২৬৬
যৌবন : 'যৌবন সাধে জলন্ত শিখা'	২৬৭
আলোছায়া : 'দিনের প্রথর আলোয়'	২৬৭
অগ্নি : 'সেও কি পড়েছে বাধা'	২৬৭
যশোদাজীবন ভট্টাচার্য	
উত্তল বসন্তে : 'ছায়া-কাঁপা ভীকু আমলকি'	২২২
রণেন্দ্রনাথ দেব	
গিনিপিগ : 'পুরোনো উজানপ্রান্তে'	৫৯
আশ্বিন : 'বালিহাঁস ফিয়ে এলো'	১০৫
নিশাচর : 'সারারাত ধ'রে'	১০৫
রবীন্দ্রনাথ সেন	
আকাশ-পিপাসা : 'তোমাকে জেনেছি যত',	১৪৫

রমেশকুমার আচার্য চৌধুরী	১০৩
সহজ : 'নব ভ'রে রক্ত কত'	২১২
নীলিমা : 'হঠাৎ গভীর শব্দে উৎকোষিক লরি'	২১২
তোমার মুহুর পয় : 'তুমি নেই! আকাশের আলো'	৩০৩
ইন্সানের বিবি ও রোদ : 'একদিন একটুও রোদ নেই'	৩০০
বিধবস্ত : 'কেউ মানে, কেউ তার নির্দেশ মানে না'	
লোকনাথ ভট্টাচার্য	২৮৩
দুই অপরাহ্ন : 'দিন হলো ক্রুর গুরু'	
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	২২১
যম : 'বিপ্রকর্ষ তোমোময় তোমার অভিধা'	
শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য	১৪২
হংসপাদিকা : 'পলাতক মুহুর্তের ছবি নিয়ে'	
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়	৬৪
ইতিহাস : 'সিঁদুর কোঁটায় মোড়া দীর্ঘ ইতিহাস'	
শহীদ কাদরী	২০৫
এই শীতে : 'শীতর্ত নিঃসত্য কিছই বাচে না'	
শান্তিকুমার ঘোষ	১২৪
সমুদ্রতীর্থ	২০৭
উত্তরণ : 'নিরন্ত সময় আর অনন্ত বিস্তার'	২০৭
রাত্রিলোক	৩১৬
আটত্রিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা : 'বিপন্ন দিকে তবু'	৩১৬
অন্ত এক সমুদ্র : 'সবুজ বিরোজা নীল',	
শামসুর রাহমান	৪০
নির্জন দুর্গের পাখা : 'মানিনি জীবন সমুদ্র সন্ধানে'	৪৫
বিরস গান : 'ইচ্ছা যার অনিচ্ছায় জীবনভোর'	১০২
জোহরার জন্ম : 'এতকাল ছিলাম একা আর ব্যথিত'	২১৫
ছিলো সে-ও : 'ছিলো সে-ও ধুলোর নিঃসঙ্গ পথে'	

যে-ছায়া আয়নার : 'যে-ছায়া আয়নার স্তাধো'	৩০৭
সে : 'প্রেম তাকে করে না আকুল'	৩০৭
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	
বৌ : 'কোথাও এমন বিন্দু নেই'	৩৪
সলিল গঙ্গোপাধ্যায়	
ট্রিগ্গেল : 'মরা ডালে আর কেন আলো তুমি'	৩১০
সুকুমার রায়	
বাগানবাড়ি : 'মন মানে না'	৩৮
ভুলিনি :	৩৮
বদি : 'নির্জন নিশ্চুপ পোড়ো বাড়ি'	১২৬
কৈশোর : 'ছোঁটি বাক : প্রলাপ যেন ভুরু'	১২৬
উপষাটিকা : 'জলের মতো চিকণ তার হাসি'	২২২
সন্দেশ : 'ঘোমটাবানি তোলা'	২২২
স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত	
তীর্থপরিক্রমা : 'এখনও গেল না ভোলা'	১২৫
ভূমা : 'সবুজের স্বরগ্রাম ফাটনের রৌদ্রে হিরণ্য'	১২৬
সুনীল চট্টোপাধ্যায়	
ঘরনী : 'মন্দির চূড়া হঠাৎ যখন জ্বলবে'	২১০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	
মিনতি : 'ঝড় দিসনে, আকাশ'	২৮৬
বিবুতি : 'উনিশে বিধবা মেয়ে'	২৮৬
সুশীলকুমার গুপ্ত	
ব্যর্থতা : 'কী ক'রে তোমাকে ধ'রে রাধি'	৩০৬
সৈয়দ শামসুল হক	
দুইজন : 'চুপ ক'রে থাকে সে আড়ালে'	৩৬
স্টাডি : 'আকাশে আগতো আঁকা'	৩৬
তার মুহুর : 'ইজদানি মারা গেছে'	১৩১



বঙ্গনী : 'আকাশে উদাসী মেঘ'	১৩২
প্রস্থানের মুহূর্তে : 'এই দেখে যাবো চলে'	২১১
মহিলাকে : শিল্পীর উত্তর—'লোকান্তর কোনো এক'	৩০২
সৌমিত্রেশ্বর দাশগুপ্ত	
শোহিনী : 'শেষ রাতের পাতলা পর্দা ছিড়ে'	৩১৪
লয় : 'আলো এখন গোলাপ হয়ে'	৩১৪
চেউ : 'ব্যান-নদীর ও পার থেকে'	৩১৫
ছন্দান কবির	
বৌবন : তোমারে ভুলিতে হবে'	৩৫
অনুবাদ-কবিতা	

কাল' ভাওবার্গের কবিতা	২২০
(অনুবাদ : কথরুজ্জামান চৌধুরী)	
১ প্রবাহ ২ ক্ষতি ৩ সত্যি ৪ পছন্দ করো	
পিএর র'সার	
(অনুবাদ : বিষ্ণু দে)	
সুনেট : 'যখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হবে তুমি, সাঁঝের বাতিতে'	৩২
ক্রাসোয়া ভিল'	
(অনুবাদ : বিষ্ণু দে)	
লে, বা বরং র'দো : 'মরণ, কাদালি নির্ভরতার জোরে'	৩১
ফেদেরিকো গাসি'রা লুকা অবলথনে	
(কবিতা সিংহ)	
একটি ইচ্ছার সংগীত : 'আহা কী বেদনার অপার প্রান্তর'	১৩৬
ক্রীডরিথ হেন্ডারলিন	
(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)	
সন্ধ্যাপত্র : 'কুটির-প্রাঙ্গণে ব'সে ক্রান্ত চানি'	২২৫
আমার সম্পদ : 'এখন হেমন্তদিন'	২২৬

ভৈরবচরনের কবিতা	
(১০০ অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য	
৪, ৫ অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)	৮৪
কয়েকটি স্বচ্ছ ক্ষণ ১	
" ১৭	
" ২৪	
ক্রস্ট : 'সন্ধ্যা, বিশাল এক আকাশ'	৮৬
গয়লানি : 'গলায় বাঁধা রুমাল'	৮৭
মৈকালি লোক-সংগীত ১-৪	
(অনুবাদ : বিকাশ দাশ)	৩৩৩
রাইনার মারিয়া রিলকে	
(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু)	
অফিয়ুসের প্রতি সনেট ১ : ৩। ১ : ১২। ১ : ২২	২২৩
শার্ল' দুক্ দ'রলেয়া	
(অনুবাদ : বিষ্ণু দে)	
র'দেল : 'পালান সব এখান থেকে পালান'	৩১
শার্ল বোদলেয়ার	
(১-৪১ অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু। ৪২ অনুবাদ : বিষ্ণু দে)	
১ ভ্রমণ : 'পঞ্জিকা, রঙিন ছবি, বালকের হৃদয়লুপ্তন'	২৩
২ কয়েকটি বিষ : 'মদের নেশা লুকিয়ে রাখে নোংরা গলি'	৪৭
৩ ঠাকড়া-কুড়ু'নির মদ : 'বস্তির সর্পিলাপথে'	৪৮
৪ নিঃসঙ্গ মানুষের মদ : 'যেমন, অছোদা হুদে'	৪৯
৫ প্রেমিক-প্রেমিকার মদ : 'সকল দিক আজ মাধুরীময়'	৫০
৬ গহ্বর : 'পান্ডাল, জগৎ জুড়ে দেখেছেন কেবল গহ্বর'	৫১
৭ ঢাকনা : 'মানুষ যেখানে থাক, সিদ্ধপারে, কিংবা আরো দূরে'	৫১
৮ ধ্বংস : 'নিত্য সে আমার পাশে'	৫২
৯ রোমাঞ্চিক পর্য্যন্ত : 'কী হৃদয় স্বর্ষের জ্যোতির্ময়, নয় বিস্ফোরণ'	৫৩

১০	একটি মুখের প্রতিচ্ছবি : 'পাখুবরনী, ভালোবাসি বাক্য ভুল তোমার'	৫৪
১১	হৃদয় জাহাজ : 'অলস মায়াবিনী, বলবো তোর, শোন'	৫৫
১২	অলিবাটু : 'মারম-মারো সকেটুকে'	১০৬
১৩	প্রতিসাম্য : 'প্রকৃতি, মন্দির এক'	১০৬
১৪	পশু কবিতা : 'কবিতা, মানসী, তুই আসাদের উপাসক, জানি'	১০৭
১৫	পূর্বজন্ম : 'সরল স্তম্ভের সারি অলিমের বিরাট নির্ভর'	১০৮
১৬	আদর্শ : 'ক্যাকাশে মরচে-পড়া, পটে-আঁকা কণসীর দল'	১০৮
১৭	মানবী : 'সে দূর অতীতে, যবে প্রকৃতির মদমত্ত রক্তি'	১০৯
১৮	দূরগত অাবাস : 'যখন, চুচোখ বুজে'	১১০
১৯	আলাপ : 'হেমন্তের হৃদয় আকাশ ভূমি'	১১১
২০	আধ্যাত্মিক উষা : 'আদর্শ দর্শনময়'	১১১
২১	ছুই বোন : 'উদার, সৌজন্যময়ী, আছে ছুই মনোরম নারী'	১১২
২২	নর্তকী সাপিনী : 'কী যে ভালোবাসি, প্রেমসী, তোমার তলুবিভান'	১১৩
২৩	অভিলষ লাভময়ীকে : 'রমনীর কোনো দুঃখ-ছবির মতো'	১১৪
২৪	লাল চুলের জিথির মেয়েকে : 'লাল চুলের, কর্ণা, একমুঠো'	১১৬
২৫	রাজহীস : 'আজ্ঞোমায়িক, তোমাকে স্মরণ করি'	৩১৭
২৬	অলংকার : 'ফেলে দিলো বসন আমার প্রিয়া'	৩১৯
২৭	মরণের নৃত্য : 'সংগাথ রমণী যেন'	৩২১
২৮	মিথ্যার প্রেম : 'অলস আদরিণী, যখন দেখি তোর'	৩২৪
২৯	স্বীকারোক্তি : 'ওমু একবার তোমার বাহর ছ্যতি'	৩২৫
৩০	সৌন্দর্যের স্তব : 'ঔৎস কি তোর চ্যলোক'	৩২৭
৩১	অচুকাপারী জাস : 'আশ্বিন, তোর অবিকল্যের মতো'	৩২৮
৩২	রক্ত কবিতা : 'আহা রে, কবিতা, বল,'	৩২৯
৩৩	লিখি : 'উঠে আয় আমার বৃকে'	৩৩০
৩৪	কোনো মালাবারের মেয়েকে : 'তোমারই হাতের মতো'	৩৩১
৩৫	মলাল : 'রক্তের, স্তম্ভের শাখা, তলুমাগে স্নিগ্ধ উপাধান,	২২৯

৩৬	বিকেলের গান : 'যদিও তোর কুটিল ক্রম-জোড়া'	২৩১
৩৭	বিড়াল : 'আমার কানুক বৃকে উঠে আর'	২৩৩
৩৮	বিড়ালেরা : 'প্রোচ ক্ষতুর আগমে, প্রণয়'	২৩৩
৩৯	বিড়াল : 'আমার মাথায় তার চলে আনাগোনা'	২৩৪
৪০	প্যাঁচারি : 'ইউগাজের কালো ছায়ার খাপে'	২৩৬
৪১	জন্মের আমন্ত্রণ : 'দয়িতা, কত্যা, বোন'	২৩৭
৪২	মাতাল হও : 'সব সময়ে মাতাল হ'তে হবে'	৩৩

### প্রবন্ধ

#### জ্যোতির্ময় দত্ত

আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা

[ স্বপ্ন, এপার গল্পা ওপার গল্পা, তৃতীয় নয়ন, লর গৌমূলি, মুন্সিল  
আগান, দক্ষিণ নায়ক, হেমন্তের দিন ]

২২৩

#### নরেশ স্তব

ওঅট ছট্টম্যান—একশো বছর পরে

৬৮

#### বুদ্ধদেব বসু

অমিয় চক্রবর্তীর পালা-বদল

১৫০

ভাষা ও রাষ্ট্র

২৫৩

#### স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমালোচনার স্বাধিকার

২২৩

### গল্প অনুবাদ

#### নূব.

ভেরআরন এসকে

১ স্ত্রফান ওসাইথ-এর আত্মজীবনী থেকে

১৭

২ রাইনার মাদিরা বিলকের পজাৎ

৮১



## চিঠিপত্র

অমির চক্রবর্তী [ ছন্দ ও কবিতা ]	২৫৯
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত [ অমির চক্রবর্তীর ছন্দ ]	২৩
নরেশ গুহ [ " ]	২৫
অশোক মিত্র [ স্বরবৃত্ত ছন্দ ]	১৮৭, ২৭৪
স্বরবৃত্ত ছন্দ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য	১৯১, ২৭৫
প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী [ জীবনানন্দার কবিতা ]	২৭
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত [ 'কবিতা'র কুড়ি বছর ]	১৮১
শান্তিকুমার ঘোষ [ বাংলা সনেট ]	২৭১

## সমালোচনা ও অন্যান্য

নরেশ গুহ [ কুকচুড়া, যখন যন্ত্রণা ]	১৬৯
ব-ব	৮৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	
সমালোচনা [ The Flowers of Evil, 100 Poems from the Japanese ]	১৭৫
সম্পাদকীয় [ হুইটম্যান, ভেরআরন, টমাস মান ]	১

## ছবি

ওঅন্ট হুইটম্যান	১৬
এমিল ভেরআরন	১৭



পঁচিশ বছরের

## প্রেমের কবিতা

আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত

সংকলিত ৬০ জন কবির আদিত আছেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ হয়েছে তরুণতম কবির রচনা দিয়ে। উপরন্তু, গ্রন্থ হুচনার সম্পাদক 'কবিতা ও প্রেম' বিষয়ে সুদীর্ঘ একটি দার্শনিক আলোচনা যোগ করেছেন। প্রবন্ধটি মূল্যবান।

জীবনের একটি পরম মূল্য প্রেমের উপলব্ধি। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানবমনের এই উপলব্ধি শিল্পের ও সাহিত্যের প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। শিল্পী প্রেমিকের, শিল্প প্রেমের সঙ্গোজ বলেই সেটা সজব হয়েছে নিশ্চয়ই।

'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' সেই রকম উৎকৃষ্ট একটি আয়নার মতো মতো, যাতে প্রতিচ্ছায়ার বিকার ঘটে না, সাম্প্রতিক কবিমনে চিরন্তন প্রেমের প্রসঙ্গ যেন-যে ভাবনা এবং উপলব্ধির সঞ্চার করেছে, তার নির্ভরযোগ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায় স্বেচ্ছায়নাতে। দাম ৪৯০। সিগনেট প্রেসের বই।

সিগনেট বুকশপ। ১২ বন্ধিম চারিহোয়া স্ট্রীট, কলকাতা ১২

১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

প্রকাশিত হ'লো

বুদ্ধদেব বহুর নতুন উপছাস

## শেষ পাণ্ডুলিপি

বিবেকবান সাহিত্যিক সুধুমাত্র সর্বজনপ্রিয় উপছাস লিখে সুখী ও সমৃদ্ধ হন না। উৎকৃষ্ট উপছাসের মনস্ত্বের দিনেও তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ অথও শিল্প সৃষ্টি করা। বুদ্ধদেব বহুর সর্বাধুনিক উপছাস 'শেষ পাণ্ডুলিপিতে' এ-কথাই সুপ্রমাণিত যে, স্ফূর্ত হাততালির প্রত্যাশা না করে উপছাস-শিল্পের সমৃদ্ধ দাবিপূরণের আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চমকপ্রদ সৃষ্টিত কাহিনী ও রচনাসৌক্যে 'শেষ পাণ্ডুলিপি'র অসামান্যতা সুস্পষ্ট। এক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের অকপট অথচ জ্বালাময় চরিত্রের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ ও চিত্রণ-নিপুণতার অবিস্মরণীয় উপছাস। দাম—গা°

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

## লেখকদের বিষয়ে

অমিয় চক্রবর্তী সম্প্রতি ক্যারিবিয়ন দ্বীপপুঞ্জবাসী ভারতীয়দের অবস্থা অধ্যয়নের জন্য ঐ অঞ্চল বিস্তীর্ণভাবে ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সাহিত্য ও ধর্মভিত্তিক অধ্যাপক। অরবিন্দ গুহ-র জন্ম ১৯২৮-এ; তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দক্ষিণ নায়ক' 'কবিতার' গত আবার প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। আবুল কাশেম রহিম উদ্দীন-এর জন্ম জলপাইগুড়ি জেলার কৃষ্ণক-পরিবারে; তিনি নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে কলকাতায় বসবাস করছেন। গোপাল ভৌমিক সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বহু পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারে কর্ম করেন। নরেশ গুহ বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদন করছেন। নিরুপম চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অম্বরগী, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং 'কবিতা'র সঙ্গে বহুকাল ধরে সম্পৃক্ত। প্রতিমা পাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ছাত্রী। শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শহীদ কাদরী ঢাকায় থাকেন, 'কবিতা'র তাঁর লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত হচ্ছে।

সংশোধন : গত আবার সংখ্যায় প্রকাশিত 'মিনতি' ও 'বিরতি' কবিতার লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপনা করেন, আমাদের এই ধারণা ভুল বলে আমরা জানতে পেরেছি। বস্তুত, তাঁর ছাত্রজীবন এখনো শেষ হয়নি।

## কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৩

একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা ৮৭

## জীবনানন্দ দাশ-এর তিনটি কবিতা

[ ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত ]

## জীবনের মানে ভালো

এখানে নিবিড় ঘাসে শুয়ে আছি—পাশে নদী—নদীতে স্টীমার ;  
এ-দিকে বাবলার সারি বহু দূর চলে গেছে—দূর—আরো দূর—  
আজ ভোরের ঝাউবনে মনে হয়েছিল, মন মৃত্যু অমৃত্যু  
সীমার বাইরে এক অফুরন্ত সূর্যের ঝড়ুর।  
এখন বিকেল বেলা লাল নীল আলো জেলে ঝাপসা স্টীমার  
কোথায় দিগন্তে যায়—কোন বাড়ী সঙ্গে আছে তার,  
জানি না কো ; কিন্তু তবু দূর থেকে শান্ত স্নিগ্ধতার  
কেমন নরম ছবি ভেসে ওঠে সন্ধ্যার আধারে ;  
মুছে যায় কুয়াশার পারে দূর ছ' সাতটি নক্ষত্রের পানে :  
শত্চিল মাদারের ডালে বসে টের পায় শিশিরের ডাণে।  
জীবনের মানে ভালো ; আরো ভালো জীবন ও মৃত্যুর মানে।



কবিতা

আখিন ১৩৬৩

### জোনাকি

অসংখ্য সবুজ শিমে শিমলতা পাতা ভ'রে আছে ;

শিম পাড়ি ;—মেয়েটিও আছে কাছে কাছে ;

চার বছরের ছোটো মেয়ে :

কাঁপছিল হিমে ;

আঁচল ফেলেছে ভ'রে শিমে ;

জায়গা নেই যে এক তিল,

তবু সে বাড়ালো হাত—তারপর খেমে গিয়ে নিজ মনে বললে, 'কেমন  
নীল—

কেমন স্বন্দর নীল শিমগুলো—

ঐ শিমগুলো, বাবা, গাছেই থাকুক ।'

নদীর মতন টলমল চোখে তাকালো সে—তারপর মুখ

নামিয়ে সে চ'লে গেল—

বেলা শেষ হ'লে

শুনলাম ভূবে গেছে পুকুরের জলে ।

অনেক গভীর রাতে দেখা গেলো জোনাকি পোকার সাথে নক্ষত্রের তলে

শিমগুলো খেলা করে শিশিরের জলে ;

আমাকে দাঁড়াতে দেখে বলে তারা : 'বুঝেছ তো কে এই জোনাকি ?'

'চিনেছো ?' বললে রাতের লক্ষ্মীপাখি ।

কবিতা

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

### মরালীরা

মাল্লবের বাখা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আশ্বাদ  
পেয়ে গেছি ; দেখেছি আকাশে দূরে কড়ির মতন শাদা মেঘের পাহাড়ে  
স্বর্ষের রাজ্য ঘোড়া ; পক্ষীরাজের মতো কমলা রঙের পাখা ঝাড়ে  
রাতের কুয়াশা ছিঁড়ে ; দেখেছি শরের বনে শাদা রাজহাঁসদের সাথ  
উঠেছে আনন্দে জেগে—নদীর স্রোতের দিকে বাতাসের মতন আবাহ  
চ'লে গেছে কলরবে ; দেখেছি সবুজ ঘাস—যত দূর চোখ যেতে পারে :  
ঘাসের প্রকাশ আমি দেখিরাছি অবিরল,—পৃথিবীর ক্রান্ত বেদনারে  
ঢেকে আছে ; দেখিরাছি বাসমতী, কাশবন আকাজ্জার রক্ত অপরাধ

মুছায়ে দিতেছে যেন বারবার—কোন এক রহস্তের কুয়াশার খেকে  
যেখানে জন্মে না কেউ, যেখানে মরে না কেউ, সেই কৃষ্ণকের খেকে এসে  
রাজ্য রোদ, শালি ধান, ঘাস, কাশ, মরালেরা বার-বার রাখিতেছে ঢেকে  
আমাদের রুক্ষ গ্রন্থ, ক্রান্ত কুখা, ফুট যুক্ত—আমাদের বিস্মিত নীরব  
রেখে দেয়—পৃথিবীর পথে আমি কেটেছি আঁচড় চের, অশ্রু গেছি রেখে :  
তবু ঐ মরালীরা কাশ ধান রোদ ঘাস এসে এসে মুছে দেয় সব ।

[ জীবনানন্দ গুর পত্রলিপিভে তারিখ দিভেন না, কিন্তু গুর আত্মা ব্রী অশোকানন্দ  
দাশ আমাদের জানিয়েছেন যে এই তিনটি কবিতার মধ্যে প্রথম দুটি অন্তত দুই  
বছর আগেকার, এবং শেষেরটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক রচনা । আন্তরিক সাধ্য  
থেকে তিনটিবই কবির বরিশাল-বাসের সমকালীন ব'লে মনে হয় ।—সম্পাদক ]

## কালিদাসের মেঘদূত

পূর্বমেঘ

অহুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

১

জনেক যক্ষের কর্ণে অবহেলা ঘটলো ব'লে শাপ দিলেন প্রভু,  
মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হ'লো এক বর্ষকাল ;  
বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরুণ সিন্ধু ছায়া দেয় যেখানে,  
এবং জলধারা জনকনয়নার স্নানের স্থিতি মেখে পুষ্য।

২

যখন আট মাস কাটলো সে-পাহাড়ে কান্তাবিরহিত কামরুর,  
শোনার করুণ স্থলিত হ'য়ে তার শূন্য হ'লো মণিবন্ধ।  
দেখলো মেঘোদয় ধূলি গিরিতে একদা আবারের প্রথম দিনে—  
বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে।

৩

কামের উল্লেখক যে করে, সেই মেঘে সহসা দেখে তার সমুখে  
যক্ষ কোনোমতে চোখের জল চেপে ভাবল মনে-মনে বহুখন :  
নবীন মেঘ দেখে মিলিত স্বর্ষাজন তারায় হ'য়ে যায় অচমনা,  
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন।

৪

কেননে প্রিয়তমা রাখবে প্রাণ তার অদূরে উত্তর শ্রাবণে  
যদিননা জলধরে বাহন ক'রে আমি পাঠাই মঙ্গল-বার্তা ?  
যক্ষ অতএব কুড়চি দুল দিয়ে সামাজিয়ে প্রণয়ের অর্থ্য  
স্নাগত-সন্তায় জানালে মেঘবরে মোহন, প্রীতিময় বচনে।

৪

৫

বাতাস, জল, ধোঁয়া এবং আলোকের কোথায় মেঘরূপী সমবায়,  
কোথায় ইন্দ্রিয়ে স্থপতি, সজ্জন প্রাণীর প্রাণপ্রিয় সমাচার !  
এ-ভেদ ভুলে গিয়ে ব্যগ্র বিরহী সে জানালে মেঘে তার যাক্সা,  
চেতনে-অচেতনে বৈত অবলোপ, তা-ই তো কামরুর স্বাভাবিক।

৬

হে মেঘ, জানি আমি ভুবনবিস্তৃত তুমি যে পুঙ্কর আবর্তের  
বশে জাত, আর সেবক ইন্দ্রের, ইচ্ছামতো নাও নানান রূপ।  
দৈব প্রতিকূল, বদ্ধ বহু দূরে, তোমার কাছে আমি প্রার্থী,  
গুণীরে অন্নয় বিফল সেও ভালো, অধমে বর দিলে নিতে নেই।

৭

প্রিয়র বাহু থেকে কঠিন বিচ্ছেদ কুপিত ধনপতি ঘটলেন,  
আমার সমাচার, পয়োধ, নিয়ে যাও, তুমি যে তাপিতের আশ্রয় !  
যক্ষপুরে যাবে, অলকা নাম, তার আছেন উত্তানে শঙ্কু,  
সৌধশ্রেণী তার চন্দ্রমৌলির ললাট-জ্যোৎস্নায় ধোঁত।

৮

যখন আরোহণ করবে বায়ুপথে, পৃথিব্যবিনিতারা অলক ভুলে  
গভীর প্রত্যয়ে দেখবে তোমাতৈই প্রিয়ের আগমন-আশ্বাস।  
আমার মতো নয় যে-জন পরাধীন, বলো তো সে কি পারে দয়িতার  
বিরহভারাতুর ব্যথা না-ক'রে দূর, গগনে তুমি যবে উদিত ?

৯

যেমন অন্তকূল পবন ধীরে-ধীরে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তোমারে,  
এবং বাম দিকে গরবী চাতকেরা একতান তোলে মধুময়,  
তেমনি নভতলে গর্ভাধানকালে মালার মতো বাঁধা বলাকা<sup>১</sup>  
সহজ অভ্যাগে, হে প্রিয়দরশন, করবে আপনাকে<sup>২</sup> সেবায় স্থবী।

<sup>১</sup>প্রাণপ্রিয় : প্রেরণীয়<sup>২</sup>বলাকা : স্ত্রীবক, বকপংক্তি। রবীন্দ্রনাথ ষষ্ঠীয় ব্যবহার করে-  
ছিলেন, কিন্তু তাঁর 'হংস'-সংযোগের ফলে বাংলায় কিছুটা ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়ে

৫



১০

অবাধ গতি নাও, জলাদ, চ'লে যাও, যেখানে একমনা ভ্রাতৃবধূ<sup>১</sup>  
দিবস-গণনায় এখনো বেঁচে আছে—বন্ধু, ভূমি তাকে দেখতে পাবে।  
ফুলের মতো মুহূরুদয় রমণীর, অচিরে বিচ্ছেদে ভেঙে যায়,  
কী আর আছে, বেলো, আশার বীধ বিনা, যা তারে তবু রাখে বাঁচিয়ে।

১১

প্রভাত হই যার পৃথিবী উর্বর, এবং ভ'রে ওঠে শিলীকে<sup>২</sup>,  
শ্রবণ-রমণীয় তোমার সেই নাদ শুনবে চকল সরল-দল,  
পাথের পল্লের টুকরো কচি ডাঁটা, মানস<sup>৩</sup>-উদ্দেশ্যে উৎস্রক,  
আকাশ-পথে, সখা, আঁকোলাস ওরা তোমার হবে সহযাত্রী।

১২

ভুবন-পূজনীর রাঘব-পদরেখা রয়েছে আঁকা যার মেঘলায়,  
তোমার প্রিয় সখা তুচ্ছ এই গিরি, বিদায় বেলো তারে তাহ'লে।  
নিত্য কালে-কালে প্রায়ট দেখা দিলে তোমার সঙ্গ সে ফিরে পায়  
নিহিত স্নেহ তার বিরহসঞ্চিত উষ্ণ অধিজলে ব্যক্ত।

১৩

প্রথমে শোনো, মেঘ, বলছি আমি সব, যোগ্য পন্থার বিবরণ,  
আমার সমাচার শুনবে তার পরে, করবে পান ভূমি শ্রবণে।  
শাস্ত হ'বে যেই, পা রেখো বিশ্রাম উদার পর্বতশ্রেণে,  
শীর্ণ যদি হও, তখন কোরো পান নদীর অতি লঘু কোমল জল।

গেছে। আমি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে সাহস পেয়ে 'স্বীকরসমূহ' অর্থে ব্যবহার  
করলাম।

<sup>১</sup>বন্ধু নামে-নামে মেঘকে 'আপনি' বলছে। ৩৮ ও ৫১ নং শ্লোক দ্রষ্টব্য।

<sup>২</sup>একমনা ভ্রাতৃবধূ : 'একপত্নী ভ্রাতৃজামাত'। 'একপত্নী' মানে পতিব্রতা,  
যে-নারীর একটি বই পতি নেই। তার প্রিয়া সাক্ষী, এবং মেঘ তাকে ভ্রাতৃ-  
বধূরূপে জ্ঞান করবে, এই ছুটি কথা একসঙ্গে জানিয়ে বন্ধু তার দূতকে যেন  
সাবধান কর'ে দিচ্ছে।

<sup>৩</sup>শিলীক : ব্যাঙের ছাতা। বৃষ্টি পড়লে ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে ; তার  
মানে, আগামী হেমন্তে ফসল খুব ভালো হবে। আধুনিক ভারতীয় কবির

১৪

তোমার উৎসাহ দেখবে মুগ্ধ তুলে মুগ্ধ অঙ্গর-অঙ্গনারা,  
চমকে মনে-মনে ভাববে বায়ু বুধি ছরণ কর'ে নিলো অঙ্গি।  
আঙ্গি বেতসের আবাস এই স্থল ছাড়িয়ে, উত্তর-আকাশে  
যাত্রা করে, পথে এড়িয়ে সাংঘাত বিপুল দিগ্‌নাগহস্তের<sup>১</sup>।

১৫

উইয়ের চিবি থেকে বেরিয়ে এলো এই ইস্পহরকের টুকরো<sup>২</sup>,  
রত্ন বহুবিধ মেশায় আভা যবে, তেমনি অভিহিত নয়নে ;  
তোমার শ্রম তহু কাণ্ডি পাবে তাতে মোহন তন্ত্রিতে উজ্জল,  
ময়ূরপুচ্ছের দীপ্ত প্রসাধনে যেমন গোপবেশী বিষ্ণু।

১৬

তোমাতে নির্ভর কুসির, তাই সব সরল জনপদবধূরা<sup>৩</sup>  
বিলাসবজিত আয়ত দৃষ্টিতে করবে সন্দেশে তোমাকে পান।  
লাঙল পেয়ে হোক সুরভি মাগভূমি, তোমার বর্ণণে দল,  
এবার লঘু হ'য়ে ধানিক পশ্চিমে, আবার দিক্‌ নাও উত্তর।

১৭

তোমার ধারাজলে ভীষণ দাবদাহ নিবলো যার, সেই আয়ুকুট  
সাদরে নেবে টেনে তোমারে বৃকে তার, জুড়েবে ভ্রমণের পরিশ্রম ;  
বন্ধ যদি চায় শরণ, তবে তার অতীত-উপকার-স্মরণে  
কুসজ্জন সেও থাকে না উদাসীন, কী আর কথা তবে মহতের।

উপেক্ষিত এই উদ্ভিদের প্রতি উল্লেখের জন্ত পংক্তিটি বিশেষভাবে আদরণীয় ;  
কিন্তু, বলা বাহুল্য, আধুনিক ভাষায় 'ব্যাঙের ছাতা' নামটাই কবিতার প্রতি-  
বন্ধক। <sup>১</sup>মানস : মানস-সংসার। রবীন্দ্রনাথের 'হংস যেমন মানস-যাত্রী'  
শ্রুতব্য। <sup>২</sup>দিগ্‌নাগ : দিক্‌হস্তী। হস্ত : হাতের শুঁড়। <sup>৩</sup>উইয়ের চিবিতে  
যে-সাপ থাকে, তার নিখাসে রামদহ রচিত হয় বলে প্রবাদ আছে।

<sup>৪</sup>জনপদবধূ : গ্রামের মেয়ে। তারা পাড়ারগেয়ে ব'লে জুবিলাস শেখেন,  
উজ্জয়িনী প্রভৃতি নগরের মেয়েরা এর উল্টো।

প্রান্ত ছেয়ে আছে আশ্রবনরাজি, ঝলক দেয় তাতে পক ফল,  
বেগীর মতো গাঢ় বর্ণধারী তুমি আরুঢ় হ'লে সেই শৃঙ্গে—  
দৃশ্য হবে যেন ধরার পরোধর, অমরমিথুনের ভোগ্য,  
গর্ভস্থচনায় মধ্যে কালো আর প্রান্তে পাণ্ডুর ছড়ানো।

কুঞ্জ ভ্রমে যার বহু বধুগণ, ক্ষণেক থেকে। সেই শৈশবে,  
মোচন ক'রে বারি স্বরাহিতগতি, নতুন পথে উত্তীর্ণ,  
দেখবে নদী এক বিদ্যা-অচলের উপলব্ধির চরণে—  
হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা যেন শীর্ণ রেবা সেই বিসর্পিতা।

যখন বর্ণ ফুরাবে, পান কোরো ত্রিভুজের রবার জল,  
জামের বনে যার আঘাত লাগে, আর বহু গজমদগন্ধে ভরা।  
বিফল হবে ব্যাঘ্র তোমার পরাভবে, হে মেঘ, যদি হও সাইবান,  
কেবল পূর্ণতা দেয় যে গোরব, লঘুতা রিক্তেরই লক্ষণ।

নব কদম্বের সবুজ-পিঙ্গল অর্ধবিকশিত বর্ণ  
ছাথে যে-শুগদল, পুলকে নেয় স্রাণ অতীত স্মরণিত বনভূমির,  
এর মুকুলিত সন্ধ্যা হুঁইচাঁপা জলার ধারে করে ভঙ্গ—  
হে মেঘ, জলকণা-মোচনে উন্মুখ, তোমার হবে তারা দিশারী।

যদিও জানি, তুমি আমার প্রিয় কাজে অচির যাত্রায় উৎসুক,  
দেখছি তবু সব কুটজসৌরভে মোদিত পর্বতে কাটবে কাল;  
সজল চোখে ক'রে তোমার অর্চনা তুলবে কেকারব ময়ূরগণ,  
বিদায়কালে দেবে এগিয়ে কিছু পথ—স্বরার তবু কোরো চেষ্টা।

তোমার আগমনে হবে দশার্ণেই বাজী হংসের বিশ্রাম,  
সেখানে উজানে কেতকী ফুটে উঠে পাণ্ডু ক'রে দেবে সাজানো বেড়া,  
গ্রামের পথে-পথে আকুল হবে তরু কাকের বাসা-বাঁধা ঝাপটে,  
পক, পরিণত, প্রচুর জন্মতে গ্রামল হবে বনপ্রান্ত।

বিদিশা নাম, সারা ভুবনে বিখ্যাত, যখন যাবে রাজধানীতে,  
তখনই পাবে, মেঘ, সকল উপচারে কামুকরস্তির পূর্ণ ফল।  
তটের কলতানে রূপসী রমণীর ভুরুর ভঙ্গিমা যে দেয় একে,  
উষি-চঞ্চল বেজবতী সেই—করবে পান তার মধুর বারি।

নীচ গিরি সেই নগরে আছে, তার শিখরে বিশ্রামে নামবে,  
তোমার মিলনের পুলকে ধরে-থরে মুঞ্জরিত হবে কদম্বেরা।  
বারান্দাদের অঙ্গপরিমলে লিপ্ত শিলাগৃহ সে-পর্বতে  
রাষ্ট্র ক'রে দেয় রত্নের উদগারে মন্ত র্যোবন নাগরদের।

শ্রান্তি দূর ক'রে যাত্রা কোরো পুন, কিন্তু নদীতীরবর্তী  
কাননে জলকণা ছিটে যেথো, মেঘ, তরুণ যুধিকার কোরকে;  
কপালে যেদ মুছে ক্লান্ত হ'লো যারা, মলিন হ'লো কানে পন্নকলি,  
আননে ছায়া ফেলে ক্ষণেক দেখে নিয়ো পুষ্পচারিকা সে-মেয়েদের।

জেনেছো, উত্তরে তোমার অভিযান; যদি বা পথ হয় বক্র,  
ভুলো না দেখে নিতে উজ্জয়িনীপুরে সৌধসমূহের উপরিতল;  
সেখানে রূপবতী পৌর নারীদের স্মরিত বিহ্বলে চকিত  
বিলোল চাহনিতো না যদি প্রীত হও, হবে যে বঞ্চিত নিদারুণ।



দেখবে যেতে-যেতে স্থলিত, মনোরম ভঙ্গি নেয় নির্বিদ্যা<sup>১০</sup>  
চেউয়ের সংঘাতে মুখর বিহগেরা রচনা করে তার কাঞ্চীদাম,  
ঘুর্ণি নাভি তার দেখায়, ভূমি তাই সরস হবে তার সন্নিপাতে<sup>১১</sup>,  
জানো তো হাবোভাবে আশ্র অহরাগ জানায় দয়িতরে প্রমদা।

বেগীর মতো ক্ষীণ জলের ধারা তার, তোমারই তাতে সৌভাগ্য<sup>১২</sup>  
তট্জ রুক্ষের জীর্ণ পাতা স্বারে পাণ্ডু করে দিলো বর্ণ;  
প্রবাসী ছিলে ভূমি, তাই তো তটিনীর বিরহ্যাপনের লক্ষণ,  
এবারে করো তা-ই, যাতে একদ্বীর স্বরিতে কেটে যায় কৃশতা।

যাবে অবস্তার পুরীতে, রুদ্ধেরা যেখানে উদয়ন-কথাবিদ<sup>১৩</sup>,  
বলেছি পূর্বেই স্বাক্ষরশীলী সেই নগর বিশালার গৌরব;  
স্বর্গবাসীদের পুণ্য হ'লে ক্ষয় যা থাকে স্বরুতির অবশেষ,  
প্রভাবে তারই যেন এনেছে ধরাধামে স্বর্গকণা এক কাস্তিমান।

সেখানে ভোরবেলা শিপ্রাবায়ু বয় ফুল কমলের গন্ধ মেখে,  
এবং দূরে দেয় ছড়িয়ে সারসের মধুর, অক্ষট কাকলি,  
অঙ্গে অহরুপ সে-বায়ু, চাট্টকার মিলনে উৎসুক প্রিয়ের মতো  
হরণ ক'রে নেয় পরশে নারিকার রত্নির উত্তরক্লাস্তি।

<sup>১০</sup> নির্বিদ্যা : মল্লিনাথের মতে যেন-নদী বিদ্যা থেকে নির্গত হয়েছে।  
<sup>১১</sup> সন্নিপাত : সংগম। <sup>১২</sup> বিরহাবস্থার প্রসিদ্ধ লক্ষণ, একদেবী ও পাণ্ডু বর্ণ,  
নির্বিদ্যা নদীতে দেখা যাচ্ছে, অতএব মেঘ ভাগ্যবান। বিরহের পরে নায়কের  
যেমন সন্তোষ, তেমনি মেঘের কর্তব্য জলবর্ণণ; তার দ্বারা নদী-নারিকার  
কৃশতা দূর হবে। <sup>১৩</sup> উদয়ন : বংগদেশের রাজা, 'রত্নাবদী' নাটকের  
নায়ক।

কেশের প্রসাধনে ধূপের নিবেদন বেরোয় অবিরল জানালা দিয়ে,  
পুঁই ভাতে, পাবে শ্রীতির উপহার, পাশিত মৃদের নৃত্য;  
শ্রান্তি হবে দূর, ঝাঞ্ঝা এ-লক্ষীরে পুষ্পবাগে ভরা ভবন,  
যেখানে আঁকা আছে ললিতা বনিতার অলঙ্করণাচিহ্ন।

ত্রিলোকগুরু যিনি দেবদাদেব, তাঁর পুণ্যধামে যেতে ভুলো না,  
নিকটে নদী বয়, সিন্ধু বায়ু তার আন্দোলিত করে উত্তান,  
এবং আনে বাস পদ্মপরাগের, সুবীতি-জলকলি-সৌরভ :—  
প্রভুর কঠোর বর্ণ ধরো, তাই দেখবে সমাদরে প্রমথগণ।

হে মেঘ, মহাকাল-দেউলে দৈবাৎ অল্প কালে যাও যদি বা,  
তবুও থেকে ভূমি, যতক্ষণে রবি না যায় নয়নের আড়ালে;  
স্বাধ্য রবে ভূমি হবে যে ঢাক, তাঁর সাক্ষ্য আরতির লগ্নে;  
মঙ্গ, গম্ভীর, মধুর নিনাদের পুণ্যফল পাবে অবিকল।

তখন বেজারী, নাচের তাগে যারা ভুলছে মেথলায় নিকণ,  
সলীল ভঙ্গিতে রত্নছায়ায় চামর নেড়ে যারা ক্লাস্ত,  
তোমার দিকে তারা ছোঁটাবে চাহনির দীর্ঘ মধুকর-পংক্তি  
কেননা নথরের আঘাতে আনে স্রুণ প্রথম বৃষ্টির বিন্দু।

নৃত্য শুরু হ'লে শিবের, ভূমি তাঁর বাহুর উত্তাল অরণ্যেরে  
ব্যাপ্ত করো মণ্ডলের নিয়ে রূপ, সন্ধ্যাক্ষরণের জবায় রাজা;  
তোমার প্রতিবেশে ভূপ্ত হবে তাঁর আদ্র অজিনের বাসনা,<sup>১৪</sup>  
তোমার ভক্তিরে শাস্ত, অনিমেষ নয়নে দেখবেন ভবানী।

<sup>১৪</sup> শিব, গজাশ্রবণের পর, মৃত অশুরের রক্তাক্ত চর্ম হাতে ভুলে নিয়ে  
নৃত্য করেছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর নৃত্যের সময় তাঁর আবার সেই ইচ্ছা

সেখানে প্রেমিকের ভবনে যোষিতেরা চলেছে পুঞ্জিত আধার ঠেলে  
বিজন রাজপথে, তামসী যামিনীতে, দৃষ্টিবিরহিত চরণে—  
দেখিয়ে নিয়ো পথ স্নিগ্ধ বিচ্যুত নিকষে কনকের কান্তি এঁকে,  
কিন্তু বরিষন অথবা গর্জন কোরো না, তারা অতি ভয়াতুর।

পত্নী বিদ্যাং ক্রান্ত হ'লে পরে ঝলক তুলে-তুলে অনেক বার,  
বিরাম নিয়ে কোনো ভবন-বলভীতে, যেখানে করপোতেরা স্তম্ভ ;  
হৃদ দেখা দিলে আবার বাকি পথে যাত্রা শুরু হোক আপনার—  
বজ্রবিনোদনে অঙ্গীকৃত জন পথে কি দেবির করে কখনো।

তখন ষড়্ভিতা নারীর আঁখিজল শান্ত করে দেবে প্রণয়ী,  
এবং নলিনীর কমল-বদনের অশ্রু মুছে নেবে হৃদয় ;  
প্রত্যাবর্তন অবাধ হোক তাঁর, স্বরিতে ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ;  
বজ্র, পাবে তাঁর তীর বিঘের রুদ্ধ করো যদি রশ্মি।

বরং গজীরা নদীর অন্তরে প্রবেশ করো ভূমি, হে স্রম্বর !  
অমল হৃদয়ের মতো সে-জলধারা তোমার ছায়াধারে ধন্ত হোক।  
চুইল পুঁটিমাছ লাকিয়ে চলে যেন, ধবল কুমুদের কান্তি—  
তেমনি তার চোখে চাহনি, ভূমি তায় কোরো না নিফল ধৈর্য ধরে।

বসন ধরে আছে শিখিল হাতে যেন, তেমনি কুঁকি আছে বেতের শাখা,  
মুক্ত কোরো, সখা, তটনিতম্বের সরিয়ে দিয়ে নীল-সলিল-বাস ;  
সহজে প্রস্থান হবে না সম্ভব, ভূমি যে তার 'পরে লম্বান,  
বিস্তৃতজঘনার বারেক পেলে স্বাদ কে আর পারে, বলো, ছাড়াতো।

জগে গুঁঠে ; মেঘ তা তৃপ্ত করতে পারবে, কেননা তার গায়ের রং কালো,  
স্বর্দাস্তের আভাষ তা আরক্ত হয়েছে; এবং সে শিবের উত্তোলিত বাহুর উপরে  
আনত।

যখন বাবে দেবগিরিতে, বাতাসের বীজন পাবে যুগ্মমন্দ,  
সে-বার রমণীয় তোমারই বৃষ্টিতে সম্ভবপুঞ্জিত মাটির জাগে,  
নাগিকারন্ধ্রের মধুর বৃহতিতে গন্ধ নেয় তার হাতির পাল,  
এবং বুনে ফল ভূমির থেকে গুঁঠে শীতল তার সৌজ্যে।

সেখানে নিত্যই আছেন কার্তিক, অধীন তাঁর সব ইন্দ্রসেনা,  
অগ্নিমুখে ফেলা চন্দ্রমোলির তীর তেজে তাঁর জন্ম,  
প্রভাবে তাঁর কাছে হৃদ পরাজিত, হে মেঘ, ভূমি তাঁকে অতএব  
পুষ্পরূপ নিয়ে আকাশগন্ধার আশ্র' ফুলদলে করিয়ে স্থান।

মগ্ন গরজনে শৈল মেঘলায় প্রতিধ্বনি তুলে অতঃপর  
নাচাবে পাবকির<sup>১\*</sup> শিখীরে, পার্বতী ঋজিত, উজ্জল পালক যার  
পুত্রস্নেহবশে যত্নে প'রে নেন কর্ণে, কুবলয়কলির পাশে—  
এবং ধবলিত নয়ন-কোণা যার শিবের ললাটের জ্যোৎস্নায়।

নিলেন শরবনে জন্ম যে-দেবতা,<sup>২\*</sup> সাদৃশ্য হ'লে তাঁর ভজনা,  
এড়াতে জলকণা, দেবেন ছেড়ে পথ সর্বাণ সিদ্ধেরা সকলে ;  
যোগ্য সম্মান দিয়ে সে-কার্তিকেরে, গেছনে রেখে সেথা রক্তিদেব—  
স্ববভিসস্তান-নিধনে পরিণত নদীর স্রোতে ক'রে অবতরণ।<sup>৩\*</sup>

যখন হবে নত জলের 'পরে, ভূমি শার্দূ<sup>৪\*</sup> বিষ্ণুর বর্ণচোর,  
গগনে গতিশীল যতক অপর অনেক দূর থেকে দৃষ্টি ফেলে  
দেখবে সে-বিপুল নদীরে ক্ষীণতম্ব, যেন এ-পৃথিবীর কণ্ঠে  
একক লহরের মুক্তমালা দোলে, মধ্যমণি তার ইন্দ্রনীল।

<sup>১\*</sup>পাবকি : পাবক বা অগ্নি থেকে জাত : কার্তিক। শিববীর্য অগ্নিমুখে  
পতিত হয়ে কার্তিকের জন্ম হয়, এই প্রবাদ আছে। <sup>২\*</sup>মভাস্তরে, শিববীর্য



সে-নদী পার হ'লে তোমার বিধের দেখবে দশপুর-বধুরা  
কৌতুহলে আর জলতাবিজমে চতুর, চঞ্চল নয়নে—  
চক্ষুপঞ্জের চট্টল উৎক্ষেপে ধবলে শোভা পায় কৃষ্ণ,  
কন্দকুম্বের আন্দোলনে যেন মুগ্ধ মধুকর ধাবমান।

ব্রহ্মাবর্তের প্রাণিত জনপদ, একদা যেথা কুরুক্ষেত্রে  
কমলদলে ভুমি যেমন ঢালো জল, তেমনি অবিরল শরজাল  
শাণিত বিক্রমে শত রাজজের বদনে হেনেছেন অর্জুন—  
এবার ছায়ারূপে যাবে সে-মুগ্ধের অজ্ঞচিত্রিত ভূমিতে।

সুহৃদ, বন্ধুর প্রণয়পরবেশে সমরে নিষ্ক্রিয় বলরাম  
প্রেরণী রেবতীর চোখের ছায়া-পড়া মনঃপুত স্ত্রী হেলার তেঁলে  
নিভেন স্বাদ যার, সৌম্য, ভূমি সেই সরস্বতী-বারি ভুলো না—  
সেবন ক'রে হবে হৃদয়ে নির্মল, বর্ষে শুধু র'বে কৃষ্ণ।

ঐ যে হিমাচল, নিকটে কনকল, গা বেয়ে নামে তার গঙ্গা,  
জহু-হুহিতা সে, সগরবংশের স্বর্ণযাজ্ঞার সিঁড়ির মতো ;  
গৌরী তাকে যত জকুটি করেছেন তত সে কেনমন হাতে  
চেউয়ের মৃতি ভুলে ধরেছে শব্দুর ইন্দু-জলা কেশগুচ্ছ।

শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং সেখানে কার্তিক কৃত্তিকাগণের দ্বারা লালিত  
হয়েছিলেন। <sup>১৭</sup>স্মরতি : পুরাণে উক্ত কামধেনু ; তার সন্তান, গোজাতি।  
দশপুরের রাজা রত্নসিংহ একবার গোমেষ যজ্ঞ করেছিলেন, তার গোরুধারায়  
এই নদীর স্রষ্টি হয়েছিলো। <sup>১৮</sup>শার্ঙ্গী : যিনি শৃঙ্গনিমিত্ত ধনুক ধারণ করেন-  
কৃষ্ণ।

আকাশে পশ্চাৎ এলিয়ে দিয়ে ভূমি, আকারে যেন এক ঐরাবত  
বক্র হ'য়ে যবে করবে পান সেই স্ফটিক-নির্মল অঙ্গ,  
তখনই আগনার ছায়ার প্রচ্ছদ ঘোড়ের বিস্তারে দেখাবে  
অতীত অভিরাম, যেন রে অস্থানে গঙ্গা-যমুনার সংগম।

সেখানে শিলাতল আসীন মুগদের নাভির সৌরভে মোদিত,  
ভূষারে সমাহিত ধবল সেই গিরি গলিত গঙ্গার উৎস ;  
শ্রান্ত হে পথিক, শিখরে ভূমি তার বিরাম নিলে হবে শোভমান—  
ধবল হরবর শৃঙ্গ হেনে যেন উদবাটিত করে পঙ্ক।

বায়ুর ফুৎকারে চমরী<sup>১২</sup>-রোমরাজি দগ্ধ করে যার ফুলকি,  
সে-খোর দাবানল, সরলরূক্ষের স্কন্ধবিক্ষেপে প্রহত,  
হুঃখ দেয় যদি নগাবিরাজে, ভূমি বিপুল বারিগাতে দমন কোরো,  
কেননা পীড়িতের আত্মনিবারণে বিস্ত শার্ঙ্গক মহতের।

মুক্ত ক'রে দিলে তাদের গতিপথ, অথচ আক্রোশে বেগবান  
লক্ষ দিয়ে উঠে শরভ<sup>১০</sup> দলে-দলে তোমায়ে করে যদি আক্রমণ,  
তখনই উত্তরোল শিলায়-বর্ণণে অঙ্গ ক'রে দিয়ে চূর্ণ—  
যন্ত্র নেয় যেবা অসম্ভবে, তার ঘটবে পরাজয় নিশ্চয়।

<sup>১২</sup>চমর ; স্ত্রী, চমরী, তিস্তী লোমশ গোত্র বা মহিষ, এর লোমে তৈরি  
পাখার নামই চামর।

<sup>১০</sup>শরভ : বেদোক্ত হিমালয়বাসী ভাগী, মহামুগ বা মহাসিংহ, কারো মতে  
উর্ধ্বনৈত্র, অগ্নিদয়ুক্ত, সিংহঘাতী হরিণ। হয়তো বা 'Abominable

সেখানে এস্তরে ব্যক্ত শিবপদ ভক্তিতরে কোরো প্রদক্ষিণ—  
সিদ্ধগণ যারে নিত্য পূজা দেন, এবং পেয়ে যার দর্শন  
সকল পাপ থেকে মুক্ত হয় সেই, হৃদয়ে যার আছে শ্রদ্ধা,  
মরণ-পরগারে প্রমথবৃন্দের পুণ্যপদে পায় আশ্রয়।

বাতাসে ভরপুর বেগুর স্তম্ভর শব্দ ওঠে সেথা অবিরাম,  
মিলিত কিম্বদন্তি বেজে ওঠে ত্রিপুরবিজয়ের গীতিকা ;  
বাজাও তুমি যদি পায়ণ-কন্দরে গভীর ধনিময় পাথোয়াড়,  
তবেই পশুপতি পাবেন উপচার পূর্ণ সংগীত-বাণ্ড।

কৌঞ্চ পর্বতে এতক্ষণে তুমি আসবে এই সব পেরিয়ে,  
রক্ত, যার ভৃগুপতির যশে ভরা এবং বলাকার বস্ম,<sup>১১</sup>  
তুমিও সেই পথে উদীচী-অভিমুখে আলম্বিত হবে তির্যক—  
মোহন রূপ যেন শ্রামল পদপাত বলির বধে রত বিষ্ণুর।

উদ্দেশ্য জাগে তার ধবল কৈলাস, সেথায় হবে তুমি অতিথি,  
শিখিল সান্নিধ্য যার রাবণ-বিক্রমে, ছালাকবিনিতার দর্পণ—  
মহান তার চূড়া ব্যাধ করে নতে শুভ কুমুদের কাঙ্ক্ষি,  
নিত্য-জন্মে-ওঠা অটহাসি যেন রাষ্ট্র করেছেন ত্যাক।

Snowman'-এর প্রবাদের এখানেই স্তম্ভপাত। <sup>১১</sup>কাক্তিকের সঙ্গে ভৃগুপতি  
বা পরশুরামের যখন যুদ্ধ হয়, পরশুরাম তাঁর ছুঁড়ে কৌঞ্চ পাঠাড় ফুটো করে  
দিয়েছিলেন। এই স্তব্ধের নাম কৌঞ্চরক্ত; তা মানস-যাত্রী হংসগণের  
স্বারস্বরূপ। মূলে 'হংসস্বার' কথাটাই ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্ম-কেটে-আনা দ্বিরদ-দন্তের গৌর আভা যার তল্লতে  
ভুমি সে-গিরিতেই যখন দেখা দেবে দলিত-অগ্নন-বর্ণ,  
শোভন হবে যেন শ্রামল বাস, বিহস্ত বলরাম স্বদে,  
বহু, আমি জানি তখন হবে ভুমি নির্নিমেয়ে দ্রষ্টব্য।

রম্য সে-গিরিতে গৌরী সেইক্ষণে করেন যদি পদচারণা,  
এবং মহাদেব ধরেন পাণি তাঁর, ভূজ-কঙ্কণ-মুক্ত—  
এগিয়ে যোগে তুমি, কিন্তু হৃদয়ের রক্ত রেখো সব বৃষ্টিবেগ,  
বরং ধাপে-ধাপে এলিয়ে দিয়ে তল্ল, সোপান হ'য়ে যোগে মণিতটের।

সেখানে নিঃসঙ্গই স্বর্গমুখতীয়া বলরাকুলিশের আঘাতে  
উল্লসিত জলে রচনা ক'রে নেবে তোমাকে স্নানধারায়ত্ত ;  
ঐশ্যে ধরতাপে তোমাকে পেয়ে তারা না যদি দিতে চায় মুক্তি,  
রক্ত গরজনে<sup>১২</sup> দেখিয়ে ভয় সেই আমোদে মাতোয়ারা মেয়েদের।

সোনার অম্বুজ ফোটে যে-সরোবরে, সে-বারি গান কোরো কখনো,  
গ্রীষ্মবতে দিয়ে কখনো স্নেহ, তার বদন ঢেকে দিয়ে সহসা,  
কাঁপিয়ে বায়ুবগে কর্পাদপের স্তম্ভ-অংকুশ-পল্লব—  
হে মেঘ, এইমতো বিবিধ বিনোদনে কোরো সে-পর্বতে উপভোগ।

<sup>১২</sup>রক্ত দীপের আলোক লাগিলো-র' অহুসরণে 'রক্ত' এখানে তিন মাত্রায়  
বসিয়েছি।



অলকা দেখা যায় অন্ধে এলায়িত, প্রণয়ী যেন তার কৈলাস,  
সমস্ত অঞ্চলে গঙ্গা নেমে আসে, ভূমিত উন্নত বিমানে,\*  
মুক্তাজাল যথা নারীর কেশে, তার শিখরে মেঘতার তেমতি—  
শৈশবী, তুমি সেই পুরীয়ে পুনরায় চিনতে পারবে না ভেবে না।

পূর্বমেঘ সমাপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ : দু-জন অসবর্ণ কবি

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন \* শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এবং এই সংকলনে সংখ্যা এবং বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই সবচেয়ে প্রধান। উদ্দেশ্যে এবং চরিত্রে এই সংকলনকর্ম যদি Oxford Book of English Verse এর তুল্য হত তাহলে এই প্রাধান্য খুবই সংগত হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে সংকলনটি নেহাৎই আধুনিক, বাংলা কবিতার যে-কালটি এতে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে তা আধুনিক কাল। স্পষ্টতই, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মতে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম আধুনিক, এবং আধুনিক বাংলা কাব্যের চূড়ো তাঁর কবিতা স্পর্শ করে গেছে।

এই মতে অনেকেই সায় দেবেন, সন্দেহ নেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের অগ্রগণ্য, রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম নতুন রবীন্দ্রনাথ নিজে, এ-জাতীয় উক্তি আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো স্বতঃসিদ্ধ থাকা উচিত নয়, এ-জাতীয় সকল সিদ্ধান্তেরই যেহেতু নিয়মিত পর্যালোচনা হিতকারী, এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার বিচার আশা করি হঠকারিতা হবে না।

আমরা যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করি, শুনেছি তখন থেকে বাংলা সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। 'প্রগতি' ও 'কল্লোলের' পাতায় রবীন্দ্র-কৃত্তিহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 'রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত' হবার চেষ্টা করে তার আরম্ভ। আজ পঁচিশ বছর পরে আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনটি হাতে নিয়ে তাই খটকা লাগে। এর সম্পাদক একদা সেই বিদ্রোহের নান্দীপাঠ করেছিলেন। আজ তাহলে হয় বিদ্রোহের অবসান হয়েছে, সেদিনের তরুণ কবিরা উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্যে যে নতুন স্রব তাঁরা

বাজাবার চেষ্টা করেছিলেন তা আসলে মূল স্বরেরই উদারতা তায়। অথবা এই বিদ্রোহ একদিন রবীন্দ্রনাথকে দলে টানতে পেরেছিল।

আমরা যদি রবীন্দ্র-রচনার অবিভেদ স্বীকার করি, যদি মনে করি জীবন-দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু অবিকল ঋজুতার পরিচয় দিয়েছেন, তাহলে তাঁকে এই সংকলনে স্থান দেয়া মানে আধুনিকতার চরিত্রকে অস্বীকার করা। কেননা, জীবনদৃষ্টির পার্থক্যই আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনকে সে-কালে অনিবার্য করে তুলেছিল। অপর পক্ষে, যদি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মত মনে নিই যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেন এবং তার পুরোভাগে এসে দাঁড়ান তাহলে ধরে নিতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এই সময় থেকে নতুন ধারায় কবিতা লিখতে শুরু করেন।

এই দ্বিতীয় মতটির বিচার করে দেখা যাক। 'লিপিকা' ও তৎপরবর্তী গ্রন্থে যে রবীন্দ্রনাথের রচনা মোড় নিয়েছে তা যে-কোনো পাঠকেরই নজরে পড়বে; এই সব রচনার আধুনিকতার অনেক গৌণ লক্ষণ উপস্থিত: কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা এখানে উপস্থিত হয়েছে, ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তুকে কাব্যের উপাদানের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, গল্প রীতির আসন কায়ম হয়েছে। বর্তমান কালের জীবনও এই কাব্যে অধিকতর প্রতিকলিত। কিন্তু এই সব লক্ষণকে গৌণ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। যে-সব সামান্য লক্ষণ 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের অধিকাংশ কবি সমকালীন, তা রবীন্দ্রনাথে অল্পপস্থিত। রবীন্দ্র-রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু একজায়গায় বলেছেন তাঁর কবিতায় উৎস বিশ্ববিধানে আস্থাবান এক চিত্তবৃত্তি। অথচ এই চিত্তবৃত্তির অভাবই আধুনিক বাংলা কবিতার মূল লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের 'প্রদ্ব' (ভগবান, তুমি যুগে যুগে) কবিতাটি প্রায়ই তাঁর আধুনিকতার নজির হিসেবে দাখিল করা হয়ে থাকে। এই কবিতাটিতে বিশ্ববিধানের শুভময়তায় প্রদ্ব এবং কবিচিন্তে সশয় কিছু প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায় এই কবিতাটির পাশে যদি আমরা জীবনানন্দের 'অদ্বুত আধার' এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ' কবিতাটি দাঁড় করাই, তাহলে তৎক্ষণাত্ বোঝা যাবে 'প্রদ্ব' কবিতাটির দুর্বলতা কোথায়। 'অদ্বুত আধার' যেখানে কবির গভীর হতাশা ও বিক্ষোভ ধ্বনিত হচ্ছে, সেখানে 'প্রদ্ব' ঈশ্বরের সঙ্গে কেবল মান-

অভিমানের খেলা। জীবনানন্দের চোখে জল নেই, কেননা তার স্তর বহুপূর্বেই তাঁর চেতনা অতিক্রম করে এসেছে। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'অশ্রুজল' কেবল কিঞ্চিৎ সাম্বনার অপেক্ষা রাখে; পাঠকের মনে সন্দেহ হয়, বুঝি বা কবির বিক্ষোভমোচন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার স্থাপনক্ষী মাত্র।

'বাশি' কবিতাটিও ('কিছু গোয়ালার গলি') আমাদের সহায়তা করবে। দীন, সাধারণ জীবন থেকে সেখানে অনেকগুলি রূপকল্প উপস্থিত করা হয়েছে। এগুলি বাদ দিলে অবশিষ্ট কবিতাটি পুরোপুরি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু রূপকল্পগুলি কী-প্রকৃতির দেখা যাক:

বর্ষা ঘন ঘোর।

ট্রামের খরচা বাড়়ে,

মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।

গলিটার কোণে কোণে

জমে ওঠে পঁচে ওঠে

আমের ধোঁসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,

মাছের কানকা,

মরা বেড়ালের ছানা,

ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।

ছাতার অবস্থানানা, জরিমানা-দেওয়া

মাইনের মতো,

বহু ছিদ্র তার।

এখানে যে কদ উপস্থিত করা হয়েছে তা কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, গলির নোংরামি প্রমাণ করা ছাড়া তার অন্য কোনো ব্যঙ্গনা নেই। এর সঙ্গে আমরা যদি জীবনানন্দের কয়েকটি পংক্তি মিলিয়ে পড়ি:

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকাক্রান্ত

মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে

দাঁড়ালাম বেস্টিক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিট বাজারে;

টানে বাদামের মতো বিষম্ব বাতাসে। ('রাহি')



তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করব চানেনবাদামের একটিনাত্র উল্লেখ জীবনানন্দ কত  
স্ফূর্তভাবে আমাদের নগর-জীবনের বিস্তৃত সন্তোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে  
চানেনবাদামে বিস্তৃত হয়েছে নাগরিক আস্থা। এলিয়টের Gerontion  
কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথের মতো একটি ফর্দ আছে।

The goat coughs at night in the field overhead,  
Rocks, moss, stonecrop, iron, merds.

কিন্তু এই ফর্দটির প্রত্যেকটি রূপচিত্র এক-একটি প্রতীক। ছাগলের কাশি,  
প্রস্তরখণ্ড, শৈবাল, পাথুরে আগাছা, লৌহখণ্ড, বিষ্ঠা—এর প্রত্যেকটি দেউলিয়া  
সভ্যতার স্বরূপ পরতে-পরতে খুলে দেখাচ্ছে।

এ-কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয় যে রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প কখনো প্রতীক  
হরে উঠতে পারে না, আমি কেবল এই কথা বলতে চাই যে আধুনিক ভাব বা  
রূপচিত্র কোনোটিকেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্বস্তি পাননি। আধুনিক কালের  
যে-রূপকল্প তিনি ব্যবহার করতে গেছেন তাতে এসেছে আড়ষ্টতার আভাস।  
যেমন ‘এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ’ কোনো আধুনিক কবির পক্ষে  
লেখা সম্ভব ছিল না, তেমনিই আধুনিকতার সব চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়  
বহিঃস্থের শোভাই থেকে গেছে, কখনো অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে নি।

আধুনিক কবিতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হয়ে উঠতে পারতেন না, রবীন্দ্রনাথের কাছে  
তাদের স্বপ্ন অমের, একথা সত্য। কিন্তু এটা স্বীকার করা আর রবীন্দ্রনাথকে  
আধুনিকদের অগ্রগণ্য বলার ভেতর অনেক তফাৎ আছে। কবি আধুনিক  
কোন গুণে হন? ভাবাব্যবহারে কিছূটা, প্রতীক উপমা উৎপেক্ষায় কিছূটা,  
কিছূটা—নিজের অজান্তে—কালধর্মিতাকে বরণ করে। কিন্তু এসবই বাহ্য।  
আধুনিকতার প্রাণ যে-মনোভঙ্গি, যাঁর উদ্ভব বিশেষ করেই বর্তমানের উপলব্ধি  
ও চৈতন্য থেকে, তার যদি অভাব কারো কাব্যে ঘটে তাহলে তাঁকে পংক্তি  
থেকে বাদ দিতে হয়।

২

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কালের কবিদের তফাৎ মূলত দুটি। সংস্কৃত  
ও বাংলা কাব্যধারার পরিপূর্ণ ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ আবাল্য অঙ্গপ্রাপিত। তবু,

বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য থেকে বর্জনও তিনি কম করেননি। প্রাচীন সাহিত্যে  
প্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যে উদার সাযুজ্য, পার্থিব সর্ববিষয়ে নির্মল আনন্দ, এবং  
সর্বোপরি জীবনের শুভময়তা সম্পর্কে যে নিশ্চিত প্রত্যয় তা রবীন্দ্রনাথের রচনায়  
সর্বদা প্রতিফলিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির সর্বাঙ্গ  
সত্যতা, বৈক্য মহাজন-পদাবলীর দেহান্তপ্রত্যয় এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের  
বাস্তবতা নেই। এজন্য কোনো আক্ষেপ বা অসুযোগ না-ক’রেও বলা যায়  
রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি জিনিশকে চিরকাল পরিহার ক’রে এসেছেন। অপরপক্ষে  
‘কল্লোল’-যুগের কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধি অতিক্রম  
ক’রে যৌবনে উপনীত হলেও, বিশ্বসাহিত্য বিশেষভাবে আশ্বাসন করেছিলেন।  
সমসাময়িক ইংরেজি বা ইওরোপীয় সাহিত্য কেবল যে কালধর্মিতায় প্রবল ছিল  
তাই নয়, তার ভেতর বাস্তবতার সহজ প্রকাশও ছিল বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ  
যে সর্বতোমুখী নন, তাঁর কাব্যে যে জীবনের সমগ্ররূপটি ধরা পড়ে নি এই  
চেতনায় তখনকার কবিকিশোরেরা বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়েছিলেন। কিন্তু  
প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অহেতু ক’রে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অভাবপূরণ করার  
চেষ্টা করেননি, নিজের প্রকৃতি করেছিলেন ইওরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের  
সঙ্গে। তার ফল শুভ কি অশুভ হয়েছিল সেটা আপাতত বিচার্য নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর একটি বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলনের হেতু কেবল এই  
নয়। রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা ইতিপূর্বে কারো চোখে পড়ে নি, সেজন্য কোনো  
অভ্যুত্তি আমাদের পিতা বা জ্যেষ্ঠতাতাদের কখনো ছিল বলে জানি না।  
রবীন্দ্রনাথ যে-কারণে আর অর্বাচীনদের তুষ্ট করতে পারলেন না তার কারণ  
বাংলা দেশের মানসিক ও সামাজিক হাওয়া-বদল। ইওরোপীয় মহাযুদ্ধ  
পাশ্চাত্য মহাদেশে এক শূন্যতা, এক অভাববোধের সৃষ্টি করে। শুভবাস্তব  
নিশ্চয়তায় পৃথিবীর লোকে আস্থা হারাণ, যে-বিশ্বাস, যে-সহজ আশ্বাসমর্গণ  
ভিত্তিকীয় চিত্তবৃত্তিকে ইংলণ্ডে কায়ম করেছিল তা যেন হঠাৎ আহত হল।  
ভিত্তিকীয় মনোভঙ্গির প্রবলতা ও তার অসারতা মহাযুদ্ধ এমনভাবে উন্মোচিত  
করল যে তার পুনরুজ্জীবন ইওরোপে আর ঘটল না। আমাদের দেশে কিন্তু তার  
প্রত্যক্ষ প্রভাব ততটা দেখা যায় নি, কেননা আমরা তখন রাজনৈতিক সংগ্রামে  
অনগ্রহণ। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন

খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল; কিন্তু মনে রাখা দরকার, তখনো এর মধ্যে কোনো ব্যর্থতাবোধ আসে নি। বরং এমন একটি স্বদেশী উদ্ভাদনা দেশময় তখন ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাতেই আমরা জীবনের অনেক দীনতা ও গ্লানি তুলে থাকতে পেরেছিলাম। কিন্তু তৃতীয় দশকের শেষভাগে পৃথিবী জুড়ে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল। বাণিজ্যে অতিমন্দা দেখা দেবার ফলে সর্বত্র বেকার সমস্যা দারুণ হয়ে উঠল, বিশ্বের মধ্যবিত্ত সমাজ আশঙ্ক্য করল তার বিলোপের সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে। চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সাধারণ শ্রমিক ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীন ও স্বত্ব বলে মেনে নিয়েছিল, এতদিনে তার স্বরূপ উল্ঘাটিত করল। মানুষের মনে এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্জেই অস্থান করা যায়। আমাদের দেশে একদিকে যেমন হাফাকার পড়ল, অতীদিকে তেমনি এলো গভীর অনিশ্চয়তা, বর্তমান অতএব অতীত ও ভবিষ্যতে অনাস্থা, এবং হতাশা। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাবশালী যে স্বাভাবিক ক্রোধ মানুষের মনে সেই সময়ে জেগেছিল, তা আমাদের দেশে প্রবল হয়ে ওঠে নি, কেননা আমাদের সকল ক্রোধের পাত্র ছিল তখন বিদেশী শাসক। স্বরণ থাকতে পারে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই কয়েক বছরই সবচেয়ে রক্তাক্ত ও গ্লানিময়।

রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচনা 'লিপিকা' পড়লে দেখা যাবে তাতে এক বেদনার আভাস আছে, ছোটোখাটো নানা দুঃখের উল্লেখ আছে। কিন্তু হৃদয়ের যে পরিপূর্ণতা থেকে বেদনা আসে, চিত্তের যে বিস্তার সর্বজায়ে সহানুভূতি আনে তা সেই সময়ে দুঃএকজন মহাপুরুষে দেখা গেলেও দেশে সমগ্রভাবে একান্তই অনুপস্থিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ দেশের দুঃখ বিরোধে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন; কিন্তু ভিন্ন ঐতিহ্যে মানুষ তিনি, কী করে সমগাময়িক হতাশার অন্তরল স্পর্শ করবেন? দেশে তখন এমনই দুর্ভোগ যে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আত্মহীন বস্তুবকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথে কোনো আস্থা বা চিন্তাশক্তি লাভ করা অসম্ভব ছিল। সমগ্রভাবে দেশের জীবন রবীন্দ্রনাথে প্রতিফলিত হয় নি, বিশ্ব জুড়ে সভ্যতার যে মড়ক তখন লেগেছিল তার আভাস সর্বশেষ 'সভ্যতার সংকটে' ছাড়া তার লেখায় নেই। তার দুর্বর আশা, গুণনিয়মিক স্বভাবের। তাঁকে ঘিরে অল্প একটি পরিমণ্ডল ঘটি

করেছিল, যা উজ্জ্বল বা ধ্রুব হলেও বর্তমান জীবন থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলন এই পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্ণ মনে হয়। সাহিত্যের সঙ্গে, শেষ বিচারে, বর্তমানের, প্রত্যক্ষ সত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে; স্তবরাং কালের প্রয়োজনে সাহিত্যেও হাওয়া-বদল অনিবার্ণরূপে দেখা দেয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম ইঙ্গিত আমরা পাঠ বীতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের রচনায়। তবু এঁরা যে কেউই আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াতে পারেন নি, তার কারণ হয়ত এঁদের রচনায় একাগ্রতার অভাব। এঁরা চেয়েছিলেন নতুনকে পুরোনোর পোষাকে সাজিয়ে পাঠকদের কাছে পেশ করতে, ভাষা ও কাব্যরীতির প্রথা থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেন নি। ফলত এঁদের কাব্যে আধুনিকতার হাওয়া এসে লাগলেও সেটা কখনো কাব্যের প্রাণ হয়ে ওঠে নি। নজরুল ইসলামে প্রাণশক্তি ছিল দুর্বল, তখনকার দিনের ব্যর্থতাবোধ তাঁর উজ্জ্বলতায় কিছুকাল বিকল্প-মুক্তিও খুঁজে পেয়েছিল; কিন্তু নজরুলের রচনা কালকে মাতালেও মনে পৌঁছয় না। তাই কিছুকালের খ্যাতি উপভোগ করে সেই কবিত্বিত আজ বৃষ্টি হয়ে গেছে। অপর পক্ষে বীতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ রবীন্দ্রনাথের পর নতুন হলেও তা যেন ভঙ্গি ছাড়িয়ে অল্প কিছু হয়ে উঠতে পারে নি। পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে এই দুঃখবাদের মূলে হয়তো কোনো আপাত-সহজ অগভীর জীবনদর্শন রয়েছে। জীবনানন্দের কবিতা-পাঠান্ত্রে কোনো-কোনো পাঠক তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্ন মত হলেও তাঁর সম্পর্কে অল্পকয় সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।

মোহিতলালের রচনায় সে-সময় যে-জিনিশটি সকলের চোখে পড়েছিল সমালোচকেরা তার নাম দিয়েছেন 'বলিষ্ঠ ভোগবাদ'। রবীন্দ্রনাথে এর অভাব ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় না এই অভাব বাজালি পাঠক তখন প্রবলভাবে অনুভব করেছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও বৈষ্ণবপাদাবলীতে বদিও ভোগের বন্দনাগান কবিতা চূড়ান্তভাবে ক'রে গেছেন, তবু মোহিতলালের কাব্য-রচনার সময় আমাদের জীবনে ভোগের বড়ো স্থযোগ বা লিপ্সা ছিল না। একদিকে রবীন্দ্রনাথের সাধিক প্রভাব, অতীদিকে রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা



ও সমাজের সংকট—এই দুয়ের ফলে বাঙালি পাঠক ঠিক মোহিতলালের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মোহিতলাল তাই কিছুটা ঝাপছাড়া ভাবে বাংলা কবিতায় এলেন এবং স্থায়ী কোনো প্রভাব রেখে যেতে পারলেন না। বিজ্ঞ জোগে আমরা আদ্যের কোনোদিনই অভিরুচি ছিল না, আমরা হয় তাকে গাইছো মশণ করেছি, নয়তো অহুরাগে সম্পূর্ণ করে তাকে গুচ্ছ করেছি। ভাবী বধুকে চোখে না দেখেই তার সম্পর্কে প্রাকবিবাহ মিলনোৎসব কণ্ঠা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কবিতায় তার প্রকাশ আমাদের কাছে নিতান্ত অশোভন লাগে। কবিতায় মোহিতলাল এই মিলনোৎসবকে যত স্নেহের সাজই পরান, পাঠকের কাছে তা নেহাতই মেসে-হাটেলে থাকা অবিবাহিত যুবকের কামকল্পনা মনে হয়।\*

৩

বাংলা নিসর্গকবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আসনটি জীবনানন্দ দাশের, একথা নিশ্চিত। কিন্তু এই দুই কবির নিসর্গকবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে আমরা প্রায় বিপরীত আশ্বাদ লাভ করি। প্রকৃতি উভয়েরই কাব্যচেতনার অবলম্বন, জীবনকে দুই কবিই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কী সেই জীবন, এঁদের চেতনায় যা প্রকৃতিতে আশ্রয় পেয়েছে?

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সহজেই বলা যায়, শুভময় জীবনের ধারণা তাঁর চোখে দেখা প্রকৃতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতিতে তিনি আনন্দ ঐশ্বর্য বিদ্যর যাই দেখেছেন, সর্বদাই মানুষের জীবনে তার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এমনকি প্রকৃতিতে যে-রূপে আছে তা যে মানুষের মনে মহত্তর আনন্দের চেতনা এনে দেবার জগাই—এই প্রতীতি কখনো রবীন্দ্রনাথে আশা, ক্ষোভ, অথবা গ্রানি এনে দেয় নি। হয়তো এর জগাই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গকবিতায় হেমন্ত ঋতুর তেমন সমাদর নেই। রিক্ততার ঋতু হেমন্ত; প্রকৃতি এবং মানুষের মনে কুদাশা, অবসাদ আর মৃত্যুর মূসর ছাড়াফেলা এই ঋতুকে তাই অনিচ্ছুক ঝাঙনা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কর্তব্য শেষ করেছেন। যে-হেমন্ত

\* আমার এই মন্তব্যে মোহিতলালের কতদূরী পাঠক যদিও কিছু হন তাকে অহুরাগ করণ 'মিলনোৎসব' কবিতাটি আবার পড়ে দেখতে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতে সংস্কারে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে জীবনানন্দের কাব্যে কিন্তু তারই অবাধ পদচারণা। হেমন্তেও যে এক রূপ ছিল তা আমরা জীবনানন্দেই প্রথম আবিষ্কার করলাম। দৃষ্টি এবং স্পর্শের যে-জগৎ জীবনানন্দ আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন তাতেই নিখাস ফেলে আমরা যেন স্বস্তি পাই। রবীন্দ্রনাথের পাঁচ ঋতু আমাদের রুদ্ধ করে সম্মত নেই, কিন্তু জীবনানন্দের হেমন্তে এসে হঠাৎ আমরা উপলব্ধি করি আসলে আমরা এককাল হেমন্তেই জীবনযাপন করেছি, হয়তো হেমন্তেই গীন হব। হেমন্তের রিক্ততায় যেন আমাদের সমাজসভ্যতার অন্তর্জলি, তার সেই নাতিশ্রাস যেন প্রকৃতিতে কুদাশার পর্দা ফেলেছে। হেমন্তের বহু ঐশ্বর্য, বহু রূপ জীবনানন্দের একাদিক কবিতায় আছে তবু তার সেই চেহারাই আমাদের মনে বেগে থাকে যার সন্ধার আকাশে নক্ষত্রেরা হিম হয়ে ঝরে যায়, যার বাতাসে বাগি পাতা ভূতের মতো উড়ে আসে, যার গাছে অল্পস্থ বাগি পাতা ঝলে ষ'সে পড়ে।

হেমন্তের বর্ণনায় যেমন, জীবনদৃষ্টিতেও তেমনি জীবনানন্দের কবিচেতনার ঘ্রুখিতা লক্ষ্যণীয়। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ উক্ত ক'রে তাঁকে আন্তিক বা নাস্তিক সহজেই প্রমাণ করা যায়। জীবনানন্দকে প্রেমিক, আন্তিক, এবং সত্যবাদী প্রমাণ ক'রে ইতিমধ্যে একদিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আন্তিকতার সিদ্ধান্তে আসা সহজ হলেও জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেটি বিপজ্জনক। একথা সত্য যে কোনো কবির অন্তিম রচনায় প্রেমপ্রীতিকরুণা ব্রহ্ম শিরচেতনার সন্ধান পেলে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হই। ইংরেজি সাহিত্যে যে-সব কবির মনে ঘিষা ছিল, বীরা একদা সংশয়ের কবিতা লিখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই পণ্ডিতেরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে জীবনের সারাছে তাঁদের সন ষ্ঠের বা সন্দেহের নিরসন হয়েছিল। মনে হয় চরম সিদ্ধান্ত এবং আশ্বাস প্রাপ্তি আমাদের জন্মান্তরের কোনো আকর্ষণ আছে, তাই কবিদের শেষ বিচারে তাঁদের আন্তিক প্রমাণ করতে পারলে আমরা খুশি হই।

জীবনানন্দ সম্পর্কে আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো আন্তিকতার স্বির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় আমরা প্রথম যে-বিষয়ের

আভাস পেয়েছিলাম তা শেষ পর্যন্ত উপস্থিত আছে। কবিতার বিষয়বস্তু বদলেছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তের স্বভূতা কখনো কোথাও আসে নি। রচনাকালের দিক থেকে সম্ভবত তাঁর শেষ কবিতা যে-তিনটি ('রক্তনদীর তীরে কালা পৃথিবীর', 'অদ্ভুত আধার এক', 'হৃদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালা মাগরের চোঁট'), তাতে অবশ্যই অমৃতের আভাস আছে; শকুন আর শেয়ালের রাজত্ব এই পৃথিবীতেও হরিতের অক্ষয় গুঞ্জরণ অথবা অস্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এই মন্ত্রগ্রহণ করতে হলে, জীবনানন্দ বলছেন, নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়কে বাঁচা করতে হবে। মানুষের বুদ্ধি, চেষ্টা, সংকল্প কোনো কাজে লাগবে না। এমন কি তার ইতিহাসচেতনাও তাকে কোন প্রভাবের প্রতিশ্রুতি দেবে না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে মহাকাল, তার প্রতি মুহূর্তে নশ্বরতা; মুছুর ধূসর ছায়াই মানুষের চেতনার চিরকাল অবিনাশী সত্য হয়ে আছে।

কিন্তু জীবনানন্দের প্রতীতি যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তাহলে কী অর্থ এই আত্মসমর্পণের চেষ্টার, কি সাধনা ভবিষ্যতে আনন্দের আশ্বাস? যদি সাহস সংকল্প প্রেমকে বিসর্জন দিতে হয়, আমাদের বুদ্ধি যদি কোনোকালে স্তব্ধ হয়ে না উঠতে পারে, তাহলে কোন ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার আমরা লাভ করব?

জীবনানন্দের অন্তিম রচনা পড়ে তাই আমি প্রতারক সাধুনার তৃপ্ত হতে পারি না। অমৃতের যে-মূল্য জীবনানন্দ ধারণ করেছেন ('জানপাপ মুছে ফেলে', 'নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়/হরিতের কাছে এসে শিখরে অক্ষর গুঞ্জরণ') মানুষ তা কোনোদিন দিতে পায়বে না, আর তা দিতে না-পারলে যদি সেই মাণ্ডল আদায় করতে শকুন আর শেয়ালের পেয়াদারা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তাহলে আশুতিকতার কী অর্থ হয়?

৪

জীবনানন্দকে বাংলা নির্জনতম কবি একাধিকজনে বলেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার বিদ্রোহের, অতৃপ্তির, ব্যক্তির অহমিকার যে স্রস্রটি বেজিছিল, জীবনানন্দ আপাতত তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে তিনি

একান্তভাবেই বাংলাদেশের কবি, ভাষা বা চিত্ররূপে কোথাও বিদেশী গন্ধ লাগে নি।<sup>১</sup> অনেকের মনে এইসব কারণে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাহলে কী অর্থে আধুনিক।

বাংলা নিসর্গকাব্যের যেটি মূল ধারা তা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বাঙালি কবির বরাবর অবিনশ্বরতার স্পর্শ পেয়েছেন। প্রকৃতি ঈশ্বরেরই আলেখ্য এবং প্রকৃতিরাজ্যে ঈশ্বরের চরম স্রায়বিধান মানুষকে অহরহ মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করছে—এই কথা বাঙালি কবির বিভিন্নভাবে বলে গেছেন। ঈশ্বর-মানুষজ্যেই প্রকৃতির এই কল্যাণীকরণ, তার ফলেই মানবজীবনে তার অস্তহীন আশীর্বাদ—এই বোধ বাঙালি কবিদের নিসর্গকবিতাকে সমর্থন করে ফেলেছে। সচেতন মন দিয়ে, মানুষের বুদ্ধি ও যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানসহকারে প্রকৃতিকে ষাটাই করার কথা কদাপি কেউ ভাবেন নি। মানুষের ইতিহাসচেতনা, বৃত্তিপক্ষপাতী মন সমাজে প্রযুক্ত হয়েছে, মানবসত্ত্বাতার ধারানির্ণয়ে সহায়তা করেছে। কিন্তু এই মন প্রকৃতিতে নিয়োজিত হল জীবনানন্দের কবিতার প্রথম। বুদ্ধির বিচারে, ইতিহাসচেতনার প্রয়োগে জীবনানন্দ ফলত অল্প সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তাঁর প্রকৃতি-প্রেম অল্প কারো তুলনায় একরতি কম না হলেও, বুদ্ধির আত্মসমর্পণজনিত প্রকৃতিবিশ্বাস তাঁর কাব্যে কোথাও নেই। প্রকৃতিকে অবিনাশী জানলেও জীবনানন্দ তার প্রতি মুহূর্তটিতে অস্তহীন প্রাণের স্মৃতিস্রোত নিতে যেতে দেখেছেন। তাই এই বিচিত্র ঐশ্বর্যময় প্রকৃতিতেও প্রেম নশ্বর, কাল বিনাশী এবং আকাশ আর প্রান্তর চিরহেমন্তে বলীল।

জীবনানন্দের কবিতায় এই চেতনা বা সিদ্ধান্ত যথার্থরূপে বিদ্রোহী, কেননা বাংলা নিসর্গকাব্যের ধারাকে বর্জন করে এখানে একটি নতুন পথ বেছে নেয়া হয়েছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র অজ্ঞাত কবির রবীন্দ্রনাথকে চোখের সামনে রেখে তাঁকে স্বীকার করার চেষ্টা করেছেন, অথচ জীবনানন্দ সে-রকম

\*এ-প্রসঙ্গে ইংরেজ রোমান্টিক কবিবল, বিশেষ করে কীটসের কথা আমি ভুলি নি। কিন্তু জীবনানন্দ এদের এমনভাবে পারিপাক করেছিলেন যে ইংরেজি-না-পড়া পাঠক মুহূর্তের জন্তেও অশাস্যাবিক কিছু সন্দেহ করেনে না। কৃষ্ণস্রোত যে প্রথম শ্রেণীর কবির রচনায় স্বকীয়তার মর্যাদা পায় জীবনানন্দ তার একাধিক প্রমাণ রয়েছে।



কোনো চেষ্টা না-ক'রেই বাংলা কবিতার চরিত্র বদলে দিয়েছেন। আজকাল কেউ-কেউ জীবনানন্দের দৃষ্টিতে ছাড়া একটিকে ভাবতেই পারেন না।

৫

জীবনানন্দের কবিতায় একটি সজ্ঞান মনের ক্রিয়া, ইতিহাসচেতনা-দ্বারা বিচারের একটি চেষ্টা আমরা বরাবর লক্ষ্য করি। অথচ এই কবি শেষে তাঁর বুদ্ধি সমর্পণ করেছেন নিজ্ঞানের কাছে, সাহস সংকল্প প্রেম আহুতি দিচ্ছেন শান্তির আকাজ্জায়। জীবনানন্দে যদি কোনো আন্তিকতা থেকে থাকে তবে তা রক্তের, পরিক্রমাক্রান্ত পথিকের আত্মসমর্পণের। হয়ত নশ্বরতার যে-আবহমান লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যুগ-যুগান্তের যে-ক্লান্তি তাঁর উত্তরাধিকার বলে জেনেছিলেন; সভ্যতার নগর-গ্রামের যে-মড়ক তাঁকে উদ্ভাস্ত করেছিল—তার সঙ্গে মাহুষের জ্ঞানের বা যুক্তির কোনো মিল তিনি উদ্ভাস্ত করেছিল—তার সঙ্গে মাহুষের জ্ঞানের বা যুক্তির কোনো মিল তিনি বুঁজে পান নি। আমাদের বুদ্ধি কেবল বিপণে চালিত করে, জ্ঞান এবং পর্দালোচনা ক্লান্তি ও নেতি ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। ঘড়ির ত্রুটি ছোটো কালো হাত আমাদের যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে নিয়ে যেতে চায়, আমরা সহজ বুদ্ধিতে সেদিকে কখনো যাবো না, তবু পারের চিহ্ন সেদিকেই চ'লে যায় 'কী গভীর সহজ অভ্যাসে'। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি বুঝা, জ্ঞান বুঝা, যুগান্তের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বুঝা।

৬

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা 'কবিতা'য় (পর্ব ১৩৬১) শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতাটি জীবনানন্দের প্রধান কবিকর্মের অজ্ঞাত এবং এতে এমন একটি মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, যা উপলব্ধি করতে পারলে জীবনানন্দ সম্পর্কে আমাদের মনস্তির করার সহায়তা হতে পারে।

পরবর্তী কালের অনেক কবিতার মতো এই কবিতাটিতে কবি কাহিনী বা তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। কাহিনীর ঠাঁকে-ঠাঁকে তাঁর প্রশ্ন আছে, সমাধিতে মস্তব্য আছে। কিন্তু এই প্রশ্ন বা মস্তব্য কবির নিজের নয়, আত্মগাতীর প্রতি জীবিতের অবিস্থাসী জিজ্ঞাসামায়া।

এই কাহিনীতে আত্মহত্যার কোন সহজগ্রাহ্য কারণ নেই। মৃত্যুর, যুগের যে-সাধ অতুল জীবন থেকে জাগে তা একেজেরে সক্রিয় নয়। প্রেম, আশা গৃহস্থালি, এমনকি বাৎসল্য রসেরও কোনো জট তার জীবনে ছিল না; তবু কোন ভূত এই ব্যক্তি দেখল, উটের গ্রীবার মতো কোন নিশ্চুপ্তা জানালায় ধার থেকে তার কানে সর্বনাশের মন্ত্র দিয়ে গেল:

কোনোদিন জাগবে না আর  
জানিবার গাঢ় বেদনার  
অবিয়াম—অবিয়াম ভার  
সহিবে না আর—

কিন্তু কেন এই মন্ত্রণা? ক্লান্তি, জ্ঞানার বেদনার প্রত্যাহের তার তো সকলেই বহন করে, তবু বেঁচে থাকার কী অসীম তুচ্ছা সকলের বুকে। পেঁচা, গলিত স্থবির ব্যাং, অন্ধকারের সজবারামে জেগে-থাকা মশা, রক্ত ক্রন্দবসার মাছি—জীবনের প্রতি এদের সকলের উক্ত অহুয়াগ অহুময়। এমনকি অরপ্রাণ ফড়িংও তার মুহুর আগের আশ্রয় প্রতিবাদ করে।

কবিতার এই অংশে বোঝাট পংক্তির সাহায্যে কবি জীবনের একটি চিত্র উপস্থিত করেছেন। এখানে লক্ষ্যণীয়, জীবনের প্রতি যে-সব প্রাণীর অহুয়াগ অহুময়, তারা অনেকেই গলিত স্থবির, থরথরে অন্ধ, রক্তক্রেদবসাজী, অন্ধকারের অধিবাসী। অথচ ঘনিষ্ঠ আকাশ, বিকর্ণ জীবন এদেরই মন অধিকার ক'রে আছে। অপরগক্ষে যে-লোকটি আত্মহত্যা করল তার রক্ত স্বাভাবিক জীবন ছিল, জীবনে স্বাভাবিক দাবি ছিল। তবু সে যে একগাছা দড়ি হাতে একা-একা অশ্বশের কাছে গেল সে কি, 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মাহুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা'—এই জেনে?

এইখানে কবি কবিতাটির আসল কথা বলেছেন। যে-জীবনের অনন্ত ঐশ্বর্যের গান 'খুসার পাড়ুলিণি'তে জীবনানন্দ গেয়েছেন, সেই জীবন সম্পর্কেই এই লোকটির প্রতীতি হল মাহুষের জন্ত তার ভালোবাসা নয়। যদি ফড়িঙের দোয়েলের জীবন মাহুষের লভ্য হত, তাহলে হয়তো জীবনের বিপুল প্রেমে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারত। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে এক

বোধ জন্ম নেয়, 'সব চিন্তা, প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।'

মাখার ভিতরে

স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।

আমি সব দেবতারে ছেড়ে

আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,

বলি আমি এই হৃদয়ের :

সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !

অবসাদ নাই তার ! নাই তার শাস্তির সময় ?

কোনোদিন ঘুমাবে না ? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ

পাবে নাকি ?

হয়তো এই ক্লান্তিতেই, অবসাদের এই ভারেই, ধীরে শুয়ে থাকার ইচ্ছা দুর্দম হয়ে উঠেছিল ব'লেই অখণ্ডের শাখায় সে দড়ির গিঠ বেধেছিল। অখণ্ড-শাখার প্রতিবাদ, জোনাকির মাথামাঝি, অন্ধ পোঁচার তুমুল গাঢ় সমাচার—কিছুই তার সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে নি। তার চতুর্দিকে জীবনের লীলা তাকে নিরন্তর দিক্কার দিয়েছে, কিন্তু এই মহাজ্ঞানী জেনেছে, এ-জীবন মাহুসের নয় ; শাস্তির সময়, ধীরে শুয়ে থাকার স্বাদ কোনোদিন সে পাবে না। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে জীবিতের মনে ব্যঙ্গ উদ্ভত হবে, কেননা যে জীবিত, যে এই মুহূর্তের কাহিনীতে বিন্মিত, তার এই ক্লান্তির ভার এখনো অসহ্য হয় নি। এই মুহূর্তকে সে তাই স্বভাবতই প্রেম করবে—

জীবনের এই স্বাদ—স্বপ্নক যবের স্রাগ হেমস্তের বিকেলের—

তোমার অসহ্য বোধ হ'ল ;—

মর্গে কি হৃদয় ছুঁড়োল

ব্যথাটা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

এই ব্যস্তের কোনো উত্তর নেই।

পরবর্তী অশেষটুকুতে মৃতের জীবন আবার পর্যালোচনা করে তার মুহূর্তের কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রেম, দাম্পত্যজীবন, সম্মেলন—

কিছুই অভাব ছিল না। কিন্তু এ-কথা বলার পর অপ্রত্যাশিতভাবে কবি বলছেন, 'তাই লাসকাটা ঘরে চিং হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।' কবিতার এই অংশে এসে কবি হঠাৎ তাঁর বিজ্ঞিততার দূরত্ব থেকে কিছুক্ষণের জন্য স'রে এলেন। জীবিত মাহুসের মুক্তিতে এই মুহূর্তের কোনো অর্থ বুজি পাওয়া যাবে না, এই কথাটা বলার জন্তই তিনি রূঢ়ভাবে কবিতাটির মোড় ফেরালেন :

হাড়হাতাতের গানি বেদনার শীতে

এ জীবনে কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;

তাই

লাসকাটা ঘরে

চিং হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

এখানে 'তাই' কথাটির ওপর অনেকখানি ঝোঁক এসে পড়ছে। মাহুসের দৈনন্দিন দুখে এই ব্যক্তিটির ছিল না, স্তবরাং এর মুহূর্ত সাধারণ আশ্রয়ত্যা নয়। সর্বপ্রকার সাংসারিক সম্মেলন এরা ছিল, তাই সে আজ আশ্রয়ত্যা। হয়তো এই সম্মেলন না-থাকলে সে তার চেষ্টায় নিজেকে ভুলে থাকতে পারত, হয়তো পরিশ্রমে, অল্পশীলনে হৃদয়ের সেই বোধ ভোঁতা হয়ে আসত। কিন্তু তার পরিবর্তে সে কেবলই ক্লান্ত হয়েছে ; প্রেম, সংসার-অর্থ, সম্মেলন কেবল তাকে ক্লান্ত করেছে ; তার সেই বোধ—যা স্বপ্ন নয়, প্রেম নয়, অল্প কিছু, তা সহবাসের শয্যাতেও তাকে বিন্মিত রেখেছে। এই ব্যাখ্যা কবি মৃতের পক্ষ নিয়ে আমাদের কাছে পেশ করেছেন। বহু বিন্মিত রাত্রির ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে লোকটি শেষে অখণ্ডশাখায় গলায় দড়ি দিল, যে-লাসকাটা ঘরে ক্লান্তি নেই সেখানে সে আজ চিং হয়ে শুয়ে আছে।

কিন্তু কবি কি এখনো মৃতের সিদ্ধান্ত বা তার কীর্তি সমর্থন করেন ? এই স্তবকেই কবি বলছেন এক বিপর বিপর্যয় আমাদের রক্তের ভিতর কাজ করে, আমাদের ক্লান্ত করে। কিন্তু এই ক্লান্তির সমাধান করতে গিয়ে সে 'লাসকাটা ঘরে চিং হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।' এখানে আর কবি মৃতের সঙ্গে একান্ত নন, এমনকি তার শুয়ে থাকার বর্ণনায় মুহূর্তকালীনও আভাস আছে।

কবিতাটি এবার মৃতের জগৎ ছেড়ে জীবিতের পৃথিবীতে ফিরে এল।



আমরা জীবিত ব্যক্তির জানি, অর্থ কীতি সঙ্কলতার পরেও ক্লান্তি আছে, আমরা জানি হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, সব নয়। তবু একই সত্য জেনে সে মৃত, আমরা জীবিত। পরিণতির এই বিষমতার জীবনের বড়ো একটা ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়েছে কবিতার শেষ অংশে, যেখানে কবি আবার পুথুরে অন্ধ পঁচাকে সেই অশ্বখেই ডালে বসিয়েছেন। পঁচার পেছন পেছন, আমরা অল্পভব করি, ব্যাঘ্র মাছি মশার বাহিনীও উপস্থিত হয়েছে। জীবনের স্রোতে কোনো টান পড়ে নি, একজন মানুষের মৃত্যু সেখানে কোনো আঁচড় কাটে না। ‘প্রগাঢ় পিতামহী’ প্যাচার সমাচারই শেষ পর্যন্ত বিচক্ষণ, কেননা কী হয় মানুষের আত্মহত্যা; জীবনে তার কোনো স্বাক্ষর নেই। আমাদের মাধার ভিতরে যে-বোধ নিরন্তর কাজ করে, যা আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত করে, তা থেকে আত্মহত্যা মুক্তি খুঁজতে যাওয়া মূঢ়তা। এই জ্ঞান নিশ্চয়ই আমরা লাভ করেছি, তাই আমরা বেঁচে থেকে এ-মৃতের কাহিনী শুনিছি। আর এই জ্ঞানের সন্ধ্যাবহার করে আমরা জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য করে চলে যাব।

জীবনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিও কবির ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তি ও কবি-স্বয়ং অভেদ, আজ আট বছর পরে যেহেতু তিনি সেই অপঘাতের পর্যালোচনা করছেন, ব্যঙ্গ তাঁকেও লেগেছে।

‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতাটিতে কবির এই প্রকীর্ণ ব্যঙ্গ—যা কবি বা পাঠক কাউকেই রেহাই দেয় নি—কবিতাটির সহজ ব্যাখ্যা বিপজ্জনক করে তুলেছে। এই ব্যঙ্গটুকু বাদ দিলে কবিতাটির কোনো অর্থ হয় না, যদি বৃত্ত্যাকে অতিক্রম করে জীবনের জয়ধ্বনি শোনাবার ইচ্ছেই জীবনানন্দের থাকত তাহলে এই পদ্ধতিতে কবিতাটি তিনি লিখতেন না। লাসকাটা ঘরের শান্তি আমাদের কাছে অবোধ, তাই আমরা প্যাচার সমাচার গ্রহণ করেছি। মনে থাকতে পারে, বধন অশ্বখশাখা, জোনাকির স্বিদ্ধ মাখামাখি সম্বন্ধে আত্মহত্যার প্রতিবাদ করেছিল, তখন এই পুথুরে অন্ধ পঁচা তার চূড়ান্ত নিষ্পৃহতা দেখিয়েছে। কবিতার শেষে, আত্মহত্যার পরও এই নিষ্পৃহতায় কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আসলে এটা জীবনেরই নিষ্পৃহতা, মানুষ যার বিধানে প্রক্ষিপ্ত।

জীবনানন্দ তাঁর সবশেষের কবিতাগুলিতে ব্যাকুলভাবে শান্তির অভিলାষী হয়েছিলেন। জীবনে পবিত্র আনন্দ ও অবিনাশী শান্তির জন্তু যেকোনো মূল্য দিতে তিনি রাজি ছিলেন; কিন্তু তাঁর এই ব্যাকুল প্রার্থনায় বস্তুত দীর্ঘ ইতিহাস, কতবিস্তৃত হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দন আমাদের বিয়গ করে তোলে। জনপাপ মুছে ফেলতে আমরা পারি নি, অহমিকার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কোনোদিন তা পারব কিনা তাও জানি না। তাই আনন্দের, শান্তির এরণ্য আমাদের আয়ত্ন্য তাড়না করবে। রবীন্দ্রনাথের গানে স্বর্গভীর আস্থায় সেই আনন্দের, শান্তির কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে। ‘অসীমের পথে জলিবে / জ্যোতি ঐক্যতারকার’—এই পঙ্কিতে বিশ্বাসের সেন্সুয়ালতা আছে, ‘তাই তোমার আনন্দ আমার পর, / তুমি তাই এসেছ নিচে / আমার নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, / তোমার প্রেম হতো যে মিছে ॥’—এই গানে অমৃতের যে-আশা বিধৃত হয়েছে—তা বিখনাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু আজকের বিশ্বজোড়া মহামারীতে আমাদের চেতনা খণ্ডিত, বিশ্বাস শিথিল। বর্তমান এমন আঠেপেঠে বেঁচেছে আমাদের যে রবীন্দ্রনাথের অমর্ত্যলোকে সহজভাবে নিশ্বাস নেয়া আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের জীবন, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের শান্তি ও আনন্দকামী চেতনার রক্তাক্ত সাধনা জীবনানন্দের কবিতায় প্রাণ পেয়েছে। জীবনানন্দ তাই আমাদের কবি।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৩

দ্বীপাবলী

ও কৃতং শ্মর

জালানি-কাঠ, জলো

জলতে জলতে বলো

আকাশতলে এসে—

‘আঙার হ’লো আলো

আঙার হ’লো আলো

পুড়লো কাঠের কালো,

পুড়লো কাঠের কালো,

নীল সন্ধ্যার শেষে ॥

বার্বেভোস দীপ

ক্যারিবিয়ান

জুলাই ১৫, ১৯৫৬

দিনান্ত

যেতে যেতে,

যরের দেয়াল রাঙা আলোয় জড়িয়ে ধরে ;

জানলা ধারে রশ্মিমালা

চেনা গাছে

সব দেয়া তার চাওয়ায় ভরে ;

যতই মেঘের দূরে দাঁড়ায়

হাসে চিরদিনের হাসি ।

ত্রিনিদাদ

জুলাই ২৪, ১৯৫৬

কবিতা

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

ধর্মতর্কিক ভ্রাতৃগণকে একদিন প্রেমোত্তরে

কিছুই না ব’লে

কী কথা গেলেন তিন ব’লে

ভগবান বৃদ্ধ, হাতে তুলে ধ’রে

পদ্মটি, আলোয় তুলে ধ’রে ॥

ত্রিনিদাদ

পোর্ট-অব্-স্পেন

জুলাই ২৬, ১৯৫৬

রাজি

কে আসে কে যায় আঙুল বুলিয়ে

আজ আকুলিয়ে

বুকের পিয়ানো বাজিয়ে সে যায়

চং চং রং হঠাৎ ছলিয়ে

কৈপে-কৈপে ওঠে আলাপে প্রলাপে ।

তারি সে আঙুল সবাব আঙুলে

আজ রাতের সব ঢাকা খুলে

একবারে এই বুকের নিভতে

কিরে আসে স্মর চির ছপুরের

বেজেছিলো ব্যথা চরম নিশীথে—

কিরে সেই এক রাগিণী বাজায় ।

সাত্তিনিক দীপ

১৭ই আগস্ট, ১৯৫৬



## কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৩

### মৃগ্য দূর

অদৃশ্যের কোটি করু চ'লে  
হঠাৎ বিস্তৃত শূন্যে আসে কোঁতুহলে  
কাছাকাছি দুই অগ্নিতারা ।  
প্রতিবেশী সৌরলোক দেখে দৃষ্টি অসৌকার  
হীরে আলো অছুলি-বিনিময় দৌছে,  
জ্যোতির মুহূর্তে চির চেনা ।  
মুছে যায় মৃগাস্তরের অজ্ঞাত ত্বরিত অন্ধকার  
স্বতিহীন মোহে ।

আকাশ জানে না  
প্রকাশ রাস্তায় এ কী কুড়োনো স্বাক্ষর,  
নক্ষত্রসমাজ খোঁজে শেষ পরিচয়—  
ওরা পরস্পর  
নূতন বিরহে পায় অভিন্ন বিচ্ছেদে দীপ্তিময়  
উদ্ভাসিত দূরে দূরে অনন্ত বাসর ।

পানান্না  
অগস্ট ২৬, ১৯৫৬

### শ্রুতি

চাঁৎকার ক'রে কে দোতলায় ডাকছে  
—“অ—ম—র দ—ত্ত”—  
মাথা নেড়ে ভাবি ঠিক ; দেখি  
হঠাৎ এ কী  
নিজের চোখ আর বাইরের লোক  
একতলার গলি আর কুমোরতলি  
যা কিছুর আছে, যা থাকছে,  
—সমস্তই তাই ।

## কবিতা

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

দুপুরে কলকাতায় সন্ধান পাই,

অগাধ বিশ্ময়ে

অপ্রমত্ত ॥

( জানি না ভদ্রলোক কে, গেলেন কারা কথা ক'য়ে )

হেইটি

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

## প্রাগৈতিহাসিক যুগেরা

জড়ো হয় মাংসলোলুপ সম্রাসীযুদ  
যখন আখরোট-বনের সেই সব অলস অপরা  
চুল খুলে কেলে, চুলের কৃষ্ণ ফোয়ারা,  
ছড়ায় যখন ভিজে শ্রাওলার জলীয় স্নিগ্ধ গন্ধ।

তখন বাইরে হয়তো দুপুর, পৃথিবী ধ্যানস্থ;  
বৈশাখ মাসের নীরব দুপুর  
হু'হাতে আখরোট জড়িয়ে এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর মতো  
যেন গভীর এক নিমগ্ন কার্ঠবিড়ালী পৃথিবীর এই আগুণীক্ষণিক ষণ্ডটুকুর  
বিশদ কোনো যুগান্তকারী পরীক্ষার রত।

ঝোপের আড়াল থেকে সম্রাসীরা দেখে গোপনে  
আখরোট গাছের তলায় ইন্ডের রমণী;  
স্নায়ুর বোদনে  
প্রতিধ্বনিত তাদের ধমনী  
শূন্য ক'রে রক্তের সমুদ্রের ঢেউ হৃদয়ের তটে  
পাখা ঝাপটায় আহত কবুতরের মতো।  
আখরোট গাছের তলায় দেহের নরম পালকে  
স্তন দুটি তার, তার দুই যুগ্মস্থ ছেলে শায়িত;  
যেখানে শ্রাওলা ঢেকেছে ঝরা পাতা আর আখরোটে  
হাত দুটি তার, অসহায় যেন, শাদা কবুতর ক্রান্ত।

তাদের স্নায়ুর সবুজ ডালের কঁকে-কঁকে  
ডেকে-ডেকে হযরান অগুনতি কর্কশ টিয়ারা;  
ঘাসের শয্যায় গুরে যুগ্মস্থ অপরা  
শরীরের উত্তাপে উষ্ণ করে ঘাসের শীতল শোণিতও

## জ্যোতিষময় দত্ত

হয়তো বা এই ভেবে, নির্বোধ দ্রবন্ত বালকের মতো  
দূর্গা-বাস পায় দ'লে, পাতা ছিঁড়ে ঘরে ফেরে লজ্জিত সম্রাসী।  
কিন্তু আজ সব কিছু বিব্রত করে; এমন কি উদ্ভত ঐ শালিকের হাসি  
কিবা পথের পাশে সর্ব্বের আলোর সর্পিণীর কণ্ঠর  
ঝলসে চমকে ওঠা, বর্ষীয়নী ঈপিতার সামনে বালক হৃদয়ের মতো।  
এ-অপরাজে বা-কিছু রোঁদে আছে শুধু তা-ই ঈপিতা,  
তপস্যার অন্ধকারে লজ্জিত জরাহীন আধারও রোঁদে ভঙ্গুর  
ইন্ড্রিয়ের দ্বারে লাল সূর্য যেন ধ্যানস্থ আত্মার রক্তাক্ত ক্ষত।

নেই তপোবনে ফিরেও নিস্তার নেই

এমন কি তপোবনে

রাখে স্বপ্নের প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য  
ত্রাসে উলঙ্গ মেয়েরা পালায়। কটকবিন্দু  
স্তনের উপর ব'সে থাকা মধুমল-পোকার মতো রক্তবিন্দু।  
পিছনে কাতারে-কাতারে আসে বৃদ্ধ, লুঙ্গ সম্রাসীর দল,  
কাঁটার ঝোপের ডালে পরিত্যক্ত, সিন্ধু বহুল  
যেন সকল কালের সম্রাস্ত, মৃত পলাতক আত্মারা  
চতুর হ'য়ে, দেহ ছেড়ে শুধু শুকনো চামড়ার  
মতো বালক হ'য়ে মুহু হুলছে।

অরণ্যে স্থির শুধু অপরাধ

ঘর্মাক্ত দেহের মাদক গন্ধের আমেজেও  
আকাশের সাত চোখ, পাতার আড়ালে সাত তারা।



## নির্বাণ

## শহীদ কাদরী

রাস্তার ধারে সে ফুলছে,—বাচাল বসন্তের অমিরাজ।

শিখিল শোকাগুলো তার হাঁ-করা চোখের

চুঁইয়ে-পড়া রসে ঘুরছে, কী মন্থন!

ঢের অলি-গলি মাড়িয়ে সে আপন

একাধিপত্যে মাননীয় ছিল সব গৃহস্থের ঘরে।

গুণীর মতো তার গলার সামান্য কসরৎ

সহজে লাগাতো তাক : মুহূ, একটু গরম,

জন্তু সবাই তারে পথ ছেড়ে দিতো,

এবং সে বিজয়ী রাজার মতো পায়ের অরণ্য ঠেলে

বেরিয়ে আসতো এই রাস্তার ধারে।

বড়ো রাস্তা,—যেখানে নখর সব, মেলায়-মেলায়

চকিত উদ্ভাসে হজা, জেজা, মুগ, যান,—

তাকে সে এড়িয়ে চলেছে চিরকাল; কেননা সেখানে তার

অস্তিত্ব শুধু একরাশ অস্বস্তির স্তূপ।

কখনও সে বৃত্ত ছেড়ে যায়নি কোথাও

এবং অলৌকিক বাসনায় ঘুরেছে চরকির মতো

নিজেরই বক্ষিম, ঋজু, লেজের পেছনে।

এমন কি মাঝে মাঝে এক একটা জুর্জোল দিন

ঘুরতে-ঘুরতে কেটেছে কী দুরাশায়!

নিজেকে করেছে সে ধাওয়া।

কিন্তু সে আশ্চর্য দূর্তিবাজও ছিল,

রঙিন বলের সঙ্গে তার উল্লাস

আনন্দে ভ'রে তুলতো সারা পাড়া,

এবং তার উদ্ভত গলা-ফোলা গর্বের ভারে

আমরা নোয়াতাম সব মাথা।

সারাদি বসন্তকাল সে জলতো শিখার মতো;

এবং ফুল-না ফুটলেও অন্তত তার লাল

চরাচর সিক্ত করে, তীব্র কামনার মদে

ডুবিয়ে দিয়েছে সব; সে-বিশাল আশারে

একান্ত নির্ভর ছিল মাতাল আরোহণ :

দৃষ্টমান অনন্ত পাল!

এখন সে নির্মোহ, পড়ে আছে একধারে, চূপ।

ফুলে গেছে জলভরা মশকের মতো;

মম্বথ হৃদয় তারে শুউশুড়ি দিলেও

তেমনি সে প'ড়ে থাকে একলা, উদাস

গৌমার বাইরে, অমিরাজ।

এবং চোখের মণিতে তার পড়েছে ধরা

নির্বিকার চিরশুন,—থেমে আছে অপরাধ

বিশাল, বাসন্তী আকাশ সন্ধ্যার,—

গভীর ধ্যানীর মতো মোহন, তন্ময়!

## দুটি কবিতা

### প্রতিদ্বন্দ্বী

আমি নির্ভুল বুঝছি। যখন রাত্রি  
সুদূর, আকাশে হৃৎ একক যাত্রী ;  
তারই অলঙ্কার আশা  
তোমার সঙ্গে লিখে দিয়ে গেছে অবোধ্য পরিভাষা।

আনত নয়নে কাজললিপি গন্ধ  
আমাকে করেছে গভীর সত্যসন্ধ ;  
আজ বুঝি মনে মনে—  
তোমার মূখের রক্তিম আভা হৃৎের চুবনে।

আকাশে ব্যাপ্ত অপার বিশাল বৃত্ত,  
তথাপি হৃৎ আজো সংযতচিত্ত  
হ'লো না। কাকে কী বলি।  
তোমার শান্ত শ্বেতনদী থেকে ভ'রে নিল অঞ্জলি।

নিজেই হলোম নিজেই নিগড়ে বন্দী,  
হৃৎ আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ;  
উভয়েরই প্রত্যাশা—  
একা সব ঢেউ গুনে-গুনে নেবে, সব ভাসা, ভালোবাসা ॥

### বিপরীত ঋতু

তোমার জননী জ্যৈষ্ঠ। তুমি উত্তাপের বৃত্তে ফুল।  
আর আমি পৌষের নির্মাণ।  
দুই বিপরীত ঋতু। মধ্যে আছে বসন্ত ; ব্যাকুল  
ঋতুর ভূমিকা, তার গান।

এ প্রায় অভাবনীয়। দু-প্রান্তে বিষম অসংগতি  
যে-সেতে স্পর্শিত সে তো চিরন্তনী স্বর্ণশ্রোতস্বতী।

তোমার জননী জ্যৈষ্ঠ। এ-সংবাদে বিমূঢ় হলোম।  
শত্রুর সাম্রাজ্যে গিয়ে কী ক'রে তোমার শান্ত নাম  
উচ্চারণ করি। সব বিতর্ক বিফল ?  
কালে-কালে লুপ্ত হবে উগ্র প্রতিবাদী কোলাহল।  
ইতিহাসে বিখ্যাত ও অখ্যাত শহর, নদী, গ্রাম—  
সকলের চেয়ে ধন্য এই শ্রোতস্বিনীটির জল।

তোমার জননী জ্যৈষ্ঠ। আমি উত্তাপের অভিলାষী।  
যদিও পৌষের কাছে ঋণী, তবু জ্যৈষ্ঠের দ্বার  
প্রার্থী হই। এক ঋতু থেকে অল্প ঋতুর সংসারে  
এসেছি। এখানে আমি এখন প্রবাসী।  
উষ্ণতার অস্থায়ী মধুর সম্মান  
নিয়ে যাবো, দিয়ে যাবো শ্বেতশুভ্র গান  
শীতের সর্বধ থেকে। আমি সংসারের কাছে ঋণী—  
দুই ঋতুপ্রান্ত ছুঁয়ে বয় একই স্বর্ণশ্রোতস্বিনী।



## অনাগত সন্ধির ভোর

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ছু লো কি ছুঁ লো না তার হাত, জাগলো পদ্ম। আর সেই রজনীতে পাগলটা  
ঘরে মরলো কেনে কিরে-কিরে—সবুজ জড়িয়ে বুধাই নামলো কালো  
অরণ্যে, বললো ব্যথা করে তাই, ব্যথা আমার মজ্জায়, আমার অন্তর-গুহার :

আর আকাশ জুড়ে, যেন হারানো দিনের রাজপুত্র কিরে এলো ভেবে, তেঁ পু  
বাজলো মেঘ। কিন্তু বুধাই—পড়লো না একবিম্ব জল; তবিত কোঁক  
কৌকীর এক জোড়া চোখের সামনে ছটকটিয়ে ম'রে গেলো।

পাগল বললো পদ্ম? কী হবে আমার পদ্ম? বাঁচাও দেখি ম'রে-বাওয়া প্রাণ,  
জল দাও দেখি জলহীনকে?

হাত বললো পাগল, তোর কথাও সমান পাগল—তবে দেখবি তোর প্রাণ,  
দেখবি তোর জল?

তবু ছুঁ লো কি ছুঁ লো না তার হাত, আবার জাগলো পদ্ম। মরীয়া হয়ে আবার  
ছুঁ লো সে, আবার পদ্ম—আবার, আবার, আবার ছুঁ লো সে, আবার পদ্ম।  
পাগল ও উঠলো খেপে, আরো আরো খেপে।

এই খেলা চললো সারা রাত। সবুজ জড়িয়ে কালো নিষ্পন্দ-নিখাস, ভূলে  
গেছে ব্যথা—মেঘ বহুক্ষণ হতবাক। কোঁকের রক্ত গড়িয়ে-গড়িয়ে নিঃশেষ  
হওয়ার আগেই রাত্রির আত্মা বৃদ্ধ কুমারী শুবে নিলো সে-উত্তাপ।

ভোর হলে পাছে কী দেখতে হয় ভেবে পাগল দিলে দোঁড় : নিজের  
চোখ দুটোকেই তার ভয়!

—তখন পদ্ম বসলো ক্রাঁদতে।

## বৃষ্টির পূর্ব যুহুত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কী ক'রে তোমাকে আমি কিরে পাবো  
এই ভিড়ে, বিজান্ত শহরে?  
যদি রাত বৃষ্টি আনে কোথায় দাঁড়াবো,  
আয়োজন হবে কার ঘরে?

দিনে হ'র্ব দুর্বিষহ, রাতে অন্ধকার,  
দিনে ভিড়, রাতে নিঃসঙ্গতা;  
কোথায় ঠিকানাহীন খোঁজাবুঁজি আরন্ত আবার,  
নৈকট্যে কোথায় গভীরতা!

কী ক'রে তোমাকে ফের কিরে পাবো  
এই ভিড়ে, নীরন্ত সংসারে;  
অনেক ক্রান্তির শেষে কোথায় দাঁড়াবো  
রাত্রির নীরন্ত অন্ধকারে?

ল্যাম্পপোস্ট আলো জ্বালে; বৈদ্যুতিক তারে  
হঠাৎ আলোর ছটা, মেঘের আকাশ;  
যদি জোর বৃষ্টি নামে, হাওয়ার জোয়ারে  
যুচবে কি সব দীর্ঘশ্বাস!

হ-হ ক'রে হাওয়া আসে, সামুদ্রিক হাওয়া,  
উড়ায় বিস্মক পাতা, পথের জঙ্ঘাল;  
খুসরিত শ্বতিতটে করে আসা-বাওয়া  
শ্রমের তরঙ্গ উত্তাল।

## কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৩

রজনী গভীরতর, পথে মাঠে শোকজন কমে,  
চমকায় বিদ্যুৎ দিকে-দিকে ;  
ঘনায় গভীর মেঘ, ঘনপাখু অন্ধকার জমে,  
আদিম গানের কলি বৃকে ।

এ-সময়ে একা একা, তোমাকে কোথায় ফিরে পাবো,  
পরিত্যক্ত, নির্জন শহরে ;  
বৃষ্টি তো আসবে জোর, কোথায় দাঁড়াবো,  
আয়োজন হবে কার ঘরে ?

## কবিতা

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

## ষোড়শপদী

## শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমি তার অঙ্গ ছুঁয়ে পাই নগ্ন অরণ্যের মুখ,  
ধারায় আহত ব্রণ, তীব্র ঐশ্যে দগ্ধ তৃণভূমি ।  
ভূলে থাকি দর্শনের মূলস্রজ, সাহিত্য, মৌলমী  
এবার কিছু বা আগে এসেছেন, সংগ্রামে উৎস্রক  
জনগণ প্রতি পথে, জননীর মাসিক আহার  
আমারি অর্জনে হয়, অবিরধবা ভগিনীর স্বামী  
বাউণ্ডলে চিরদিন, পৃথিবীর দায়িত্বের হার  
আমি পরি কৌতুহলে, প্রভাতেই গর্ভ হতে নামি ।

চক্ষেতে গৈরিক নদী রঙ্গনটী দশমীর মতো  
বসনে বিছার মাছ কুচি-কুচি পালকের মণি ।  
মোদুরের কাঁটা অঙ্গে, হাওয়ার হাসির ভারে নভ;  
স্বহর্পিত পদ্মনাগ অন্ধকারে খোঁজে পদ্মযোনি ।  
আমি সব ভূলে থাকি অহুজ্জ্বল বর্ষায় শরতে,  
নদীর, পাখির রং, যদি পাই অরণ্যের মুখ,  
অন্ধকার স্তনভার, তপ্ত মগ্ন নিখাসের প্রোতে  
সিক্ত হই মত্ত সিংহ, সিক্ত হোক সিংহের চিবুক ।



## দুটি কবিতা

(মধুসূদনকে)

আবুল কাসেম রহিমউদ্দীন

সর্বনাশের হুঁশ যেখানে জলে  
সেখানে হঠাৎ তোমার চোখের ছায়া  
দহনের চিতা আড়াল করেছে বলে,  
যদিও ক্লপণ তোমার মনের মায়া  
আমার পৃথিবী তুমিই করেছ জয়,  
তোমাকে দিলাম আমার যা সঞ্চয়।

অবশ্য নেই দিব্যবিলাসী টেটে,  
হতেও চাইনি নটরাজ-অম্লচর,  
কর্ণভায়া আমাকে ডাকে না কেউ—  
বৈশ্ণব দেবী আমাকে দেয়নি বর।  
তোমার যোগ্য হয়তো কিছুই নেই,  
তবুও দিলাম আমার যা তোমাকেই

দিলাম আমার মনের তীব্র জ্বালা,  
 বিফল পূজার দুঃখের নামাবলী,  
 বেদনার নীল অপরাধিতার মালা  
 আর পথ-চাওয়া ব্যর্থ কৃষ্ণকলি ।  
 সঙ্গে মিলাই ঝড়ে ঝরে-পড়া আশা  
 এবং হৃদয়, হৃদয়ের ভালোবাসা ।

হয়তো জীবনে পেয়েছ যা-কিছু পাওয়া,  
হয়তো রঙিন অল্প পৃথিবী কোনো  
পেয়েছে তোমার মনের উষ্ণ হাওয়া,  
তুমিও ফুলের আসরে ইমন শোনো।

কাজের আমার অর্ধ্য বা উপাসনা  
তোমার চলায় পথের বিড়ম্বনা !

তবুও আমার পৃথিবী তোমার হাতে ;  
তোমারই ধ্যানের অঙ্গীমে হয়েছে জন্ম  
যা কিছু আমার, হে আমার প্রিয়তমা !  
তুমিই অন্ত অন্তিম বেদনাতে,  
যদিও তোমার রূপণ মনের মায়া  
পাইনি, পেয়েছি উদাস চোখের ছায়া ।

ध्यान

শুধু পূজারীর মন যদি হয় অমলিন  
যদি তার ধ্যানে একেরই প্রদীপ জলে,  
বাসি ফুল, বাসি মস্তেও নাকি কোনোদিন  
মাটি-পাথরের প্রতিমাও কথা বলে।

তুমি সচেতন, ধ্যানের বেদীতে বাঙ্ঘয়,  
জ্ঞানের তীর্থে যাত্রী তোমার প্রাণ,  
ফুলের বদলে তোমাকে দিয়েছি এ-হৃদয়—  
তোমাকে দিয়েছি সারাজীবনের গান।

প্রার্থনা হয়ে পরশ হয়েছি বাতাসের  
অথচ পাইনি তোমার মনের সাড়া,  
তোমার দিনের খেয়ালি খেলায়, আকাশের  
ব্যর্থ দেয়ালি আমার রাতের তারা।

মাটির প্রতিমা কিংবা নিয়তি পাথরের  
তুমি নও, তুমি কঠিন কি তারও চেয়ে,  
অথবা রঙিন খেলনা, শিশুর আদরের,  
অথবা কি শুধু রূপকথা-শোনা মেয়ে ?

নিঃশব্দ দুপুরের বিষণ্ণ আলোয় মাছরাঙা  
ওড়ে সবুজ পানাপুকুরের ধারে নিমগাছের  
পাতার ফাঁকের শাদা আকাশটুকুতে। কখনো বা  
জলের ধারে এসে বসে, ছায়া-ঢাকা লাল মাটির  
রাস্তায় সবুজ ঘাসবুহুনির উপর, ও যেন  
একটা চকমকি পাথর; এখুনি ইচ্ছে করলে  
জাগাতে পারে আশ্চর্য দুপুরের ঘুমন্ত আকাশ;  
এক টুকরো আগুনের ফুলকির মতো হঠাৎ  
চমক লাগিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে এই ক্রান্তির  
গুপ্তন। এই নির্জন অবকাশের মধ্যে ঐ শুধু  
চঞ্চল, উৎফুল্ল ডানার ভর ক'রে একবার  
গাছের পাতা ছুঁয়ে যায়, আবার গিয়ে বসে জলের  
ধারে; জলের আয়নায় হয়তো আকাশকে দেখে  
নয়তো মধুর শামুকের সঙ্গে মিতালি পাতায়।

আমার হৃদয়ে নেই লোকাভীত একান্ত গোলাপ,  
সোঁরভের উন্মোচনে যার রূপসী মহিলা তুমি,  
তুমি হবে প্রমোদের রানী নেপথ্যে বসন্তদিনে।  
বরণ হৃদয় আজ ভয়াবহ তীব্র তিক্ত গন্ধের অধীন। ভ্রমে যদি  
নিষ্ঠুর দুর্গন্ধে ভরা এই হৃদয়ের মনে করো  
অলীক অগ্নান ফুল, সে কার চক্রান্ত তবে, কার?

আমার হৃদয় যেন অতীতের বিপরীত নগর,  
যেখানে প্রেতের মতো ভাঙা থামে নিশাস্তের হাওয়া  
মাথা কোটে অবিরাম, শূন্যতায় তারার বৈভব।

মানি না আত্মার আয়ু যতিহীন, স্বর্গ-নরকের  
প্রান্তর কাহিনী শুনে কখনো হইনি বিচলিত।  
‘দেহের বিনাশ হ’লে পরপারে পুনর্মিলনের  
উৎসব উজ্জ্বল হবে’—করবো না সে-কথা স্বীকার।  
বিশ্বাসের ঝুলি ঝেড়ে অস্তাবধি পাইনি তবুও  
অন্তত একটি কণা শাস্তনার। তাই বলি, তুমি  
আমার কামের ফুলে মুগ্ধরিত হও দ্বিধাহীন:  
তোমার অধর দাও, দাও তুমি মধুর আলতো ভরা কেশের মিনার,  
এব বিশ্বাস করো তোমাকে যে ভালোবাসি, তার  
চিহ্ন তুমি কখনো পাবে না থুঁজে প্রথাসিক পথে ॥



কবিতা  
আখিন ১৩৬৩

স্বপ্ন

### গোপাল ভৌমিক

শীতের দিনে শিশিরে ভেজা ঘাস  
চাইলে তুমি পাবে কি বারো মাস ?  
করণা-প্রীতি বিশেষ মুহূর্তের  
চিরন্তন হয় কি ? যদি জের  
টেনেই চলি কেবল পূর্ণাঙ্গর,  
সময়াতীত হৃৎ-স্বয়ংবর  
শিশির-কণার মৃত্যু আনে ডেকে  
কমলা রোদে ভোরের হাসি ঢেকে ।

কবিতা  
বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

### অম্বরনাথ

বুদ্ধদেব বসু

গিরেজিলাম ব্রহ্মের ধারে  
বিকেলবেলা ;  
বরফ-গলা-হীরক-জলা  
কচিং ঢেউ করে থেলা ।  
ঠাণ্ডা দিন, আকাশ যান,  
বাতাস যুহ,  
ঘোমটা-পর্য নটীর মতো  
নতুন ঋতু  
চটুল, ছোটো, অলংকারে  
ছিটিয়ে দেয় ঝিকিমিক—  
সঙ্ক-ফোটা সবুজ পাতা, ছোটো রঙিন  
রবিন্ পাখি ।  
ভালো তো সব ;—কিন্তু কেন  
অবশেষে  
তাকিয়ে থাকি যেখানে জল  
দিগন্তের শূন্যে মেশে ;  
এবং ভাবি, ‘বাধা’—  
ঐ ওপারে লুকিয়ে আছে  
আমার অম্বরনাথ ।’

চলেছি নীল হাওয়ায় ভেসে  
এরোপ্লেনে  
পাহাড়-বন-শহর-ভরা  
বসুন্ধরায় সঙ্গে টেনে ।  
স্বচ্ছ ভোর, গোলাপি রোদ,  
রাপসা মাটি,

### কবিতা

আশ্বিন ১৩৬৩

বইয়ের থোলা পাতায় মেশা  
কফির বাটি  
পেরিয়ে যায় দাবার ছকে  
গির্জা, হোটেল, নির্জনতা,  
ইতস্তত জুয়ার-চুড়ায় আর বছরের  
তন্ময়তা।  
দেখছি সবই ;—কিন্তু তবু  
মনে-মনে  
খুঁজি কোথায় মিলায় ছবি  
মৌলিকের অস্থেয়ণে ;  
কেবল বলি, 'বাধা !—  
হয়তো পিছে লুকিয়ে আছে  
আমার অম্মরাধা।'  
  
দাঁড়িয়েছি এক সাগর-তীরে  
বেলাবেলি,  
রজস্বল জগৎ এসে  
যেথায় করে জল্‌কেলি।  
নরম দিন, উগার জল  
রৌদ্র মাথা,  
কার্কে-র ভিড়ে পটের মতো  
দেখছি আঁকা  
সোনালি চুল, নীলাভ চোখ,  
বিরাম, স্রব, নিটোল ছুটি,  
সন্তোষের আঁচল-ধরা নির্গেদের  
কঠিন যুষ্টি।  
মৃদ্ধ আমি ;—তবুও মন  
হঠাৎ ভাবে

### কবিতা

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১

উঠবে কখন যবনিকা  
নটেধরীর আবির্ভাবে ;  
এবং বলে, 'বাধা !—  
ছন্নবেশে লুকিয়ে আছে  
আমার অম্মরাধা।'

আবর্তমান কমলালেবুর  
পরিশ্রমে  
অন্ন-মধুর ইন্ড্রিয়লোক  
সকল দিকে উঠছে জ'মে।  
স্বপ্ন আয়, ধ্রুপদী কাল  
অপরিস্রাণ,  
অথচ এক আবেগময়  
ব্যাকুল বান  
ফেনিয়ে তোলে সাগর, বন,  
নগর, বীপ; শৈলশ্রেণী,  
এমনকি দূর ছায়াপথের পরমাণুর  
দাঁপ্ত বেণী।  
বুঝি তো সব ;—তবুও মন  
অন্ধকারে  
হাৎড়ে বেড়ায় প্রামাণ্য এই  
উন্মোচনের পরপারে ;  
কেবল বলে, 'বাধা !—  
আগুন ছায়ায় লুকিয়ে আছে  
আমার অম্মরাধা।'



## হাইনে: ফাউস্ট ও ফীনিজ

## জ্যোতির্ময় দস্ত

আধুনিক কবিতার উন্মেষকালে ১৮৫৬ সালে হাইনরিখ হাইনের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এই একশো বছরের পুরোনো আধুনিকতার ও হাইনের মৃত্যুর, উভয়েরই শতবার্ষিকী আমরা একই সঙ্গে পালন করতে পারি। প্রচুর জাঁকজমক ও প্রাতিষ্ঠানিক আড়ম্বর সহযোগে উৎসব করার এই প্রকৃত সময়। আধুনিকতা যেমন এই একশো বছরে এক সম্ভ্রান্ত চেহারা পেয়েছে, অন্তত একজন কবি—ভালেরির মৃত্যুতে যেমন সমস্ত রাষ্ট্র বিপুল সমারোহে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয় পালন করেছেন—তেমনি হাইনেরও প্রাণ্য বরাদ্দ নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। তিনিও যে বঞ্চিত হয়েছেন এমন নয়। চতুর্দিকেই হাইনেকে স্মরণ করা হচ্ছে। একশো বছরে তাঁর তীক্ষ্ণতা ক্ষয়ে গেছে, যেমন আমরা সময়ের সাহায্যে অতিকার জানোয়ারকেও জাদুঘরে রাপি এবং নির্বোধ মানব-শিশুরা পরম অবহেলা ভরে তাদের দাঁতে টোকা মারে, তেমনি সেই একদা বিদ্রোহীকে আমরা প্রায় প্রতিষ্ঠানিক ক'রে ফেলেছি।

আধুনিক কবিতার সঙ্গে হাইনের যে-কোনো একটা সম্পর্ক বার করার প্রলোভন ত্যাগ করা এসময়ে অসম্ভব। এবং সে-সম্পর্কগুলি আবিষ্কার করাও কঠিন নয়। তাঁর জীবন যেমন আধুনিক শিল্পী-জীবনের প্রতীক, তাঁর কালের ইতিহাস আমাদেরই এই একশো বছরের অভিজ্ঞতার উপমা। আধুনিক শিল্পী যেমন নিজের সমাজ, রাষ্ট্র এবং স্থানে-স্থানে এমনকি নিজ সংস্কৃতি থেকে নির্বাসিত, তেমনি হাইনেও ধর্মচ্যুত ও স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পিতৃদত্ত ইহুদি ধর্মও যেন তাঁর প্রতি গৃহহীনতার দণ্ড-বিশেষ। এমনকি, তিনি মৃত্যুতেও আধুনিক। প্যারিসের শেষ অন্ধকার বছরগুলিকে তাঁর শেষ জীবনের ভক্ত, সঙ্গী ও কবিতার অন্ত্রবাদক নেদরভালের রচিত কোনো রক্ত-দৃশ্যের দলে ভ্রম হতে পারে। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত কবির অন্ধকার ঘর, তাঁর একটি চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ, অজটের পাতা খুলতে কিংবা বন্ধ করতে হয় প্রায় বিকল ডান হাত দিয়ে, ঘরের কোণায় থঞ্জে যষ্টি টুটি (যেন কোনো অজুত, কাঁটার আচ্ছন্ন, বায়ুরের প্রতিবন্ধ, নিষ্প্রভ উদ্ভিদ), ঘরের বাইরে কোকোতের—

তাঁর জীবন প্রিয় টিয়াটির—কর্কশ গলায় ফরাসী গালিগালাজ, ও শেষ কয়মাসে, সেই রহস্যচ্ছন্ন মহিলা যিনি জাতিতে স্ত্রীর কিংবা পোল, কিংবা হান্সেরীর কিংবা চেক, বার নাম এলিজে, ওরকে কমিই ওরকে বেলজের্ন ওরকে মার্গিট, এবং যিনি মাইগনের, হাইনে ও টেইনএর যথাক্রমে সহচরী, সেক্রেটারি, প্রেমিকা ও রক্ষিতা হবার সন্দেহজনক গৌরবেই অধিকারিণী; এই সব কিছু মিলে মৃত্যুর জন্ত তাঁর এগারো বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার দিনগুলিকে এক অতি-বাস্তব আবহাওয়ায় ঘিরে রাখে। টমাস মানের ধারণা শিল্পী মাত্রেই অসুস্থ এবং শিল্পকর্মের প্রেরণা জোগান শরতান স্বয়ং। সমস্ত যুগের শিল্পীদের বেলায় প্রযোজ্য না হোক, আধুনিক শিল্পীর বেলায় একথা ঠাটে। এবং প্রথম দৃষ্টিতে হাইনের জীবন ও শিল্পকর্ম যেন এই মতের স্বপক্ষে চরম সাক্ষ্য। যে-ফাউস্টের কাহিনী তাঁকে সমস্ত জীবন অনুপ্রাণিত করেছিলো এবং যে-প্রেরণার কথা জানিয়ে তিনি গ্যোটের বিভাগভাজন হন, সেই ফাউস্ট-পুরাণ যেন তাঁরও নিজের জীবনের চিত্রকল্প। অল্প বয়সে, গটিনজেনে ছাত্রাবস্থায় তিনি যে যৌন ব্যাধির বীজ আহরণ করেছিলেন, শেষ বয়সে সেই ব্যাধিই তাঁকে পলু ক'রে দেয়। এমনকি সেই ব্যাধির ক্রমপ্রকাশ ও সে-সম্পর্কে তৎকালীন চিকিৎসা-শাস্ত্রের ধারণাও যেন কোনো আধুনিক লেখকের বিখ-ব্যাপী ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে লেখা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো মনে হয়। যেমন আরি মিশো, কী কাফকার রচনায় কেউ বোঝে না কোথা থেকে নির্দাকরণ আঘাতগুলি আসে ও সেই আঘাতের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় তারা যেমন হাতকর সব প্রতিষেধকের আশ্রয় নেয়, তেমনি হাইনের বোগের স্বরূপ কোনো চিকিৎসকই ঠিক ধরতে পারেননি। তাঁদের ধারণা হয় যে তাঁর মেরুদণ্ডের মজ্জা গলে গেছে। সেই কারণে যখন ব্যথা প্রবল হ'তো তাঁর মেরুদণ্ডে গরম লোহার ছেঁকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আফিমের গোলায় যা গুলি ভিজিয়ে রাখা হ'তো। কোন শরতানের নরক এই অনন্ত এগারো বছরের চেয়ে দীর্ঘ? এই ভাস্কির চেয়ে নিষ্ঠুর ও পরিত্রাণের উপায়বিহীন?

বাল্যকাল অতিক্রমের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৮১০ থেকে ১৮৫৬ শাল, এই স্বল্প পরিসরের ইতিহাস আমাদের এই একশো বছরের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। আমাদের শতাব্দীর শুরুতে ছিলো এক অশুভাবী

শাস্তি, নিশ্চিন্ততা ও প্রগতির কাল। বিসমার্কের জয়লাভে যদিও অন্তত ফরাসী জাতির মনে আক্ষেপ ও অনুযোগের অবধি ছিলো না, তবুও অল্প কয়জন ব্যক্তিরকে কারুরই মনে হয়নি শাস্তি কতো ভঙ্গুর, 'প্রগতি' স্থবির, ও চতুর্দিকে বৈশিষ্ট্যবিলোপকারী কোনো শক্তির উদয় হচ্ছে। ঐতিহাসিক বুকহার্ডট, দার্শনিক নীচশে, কবির গ্যোবা, সমাজপুরণ-রচয়িতা স্পেন্সার প্রভৃতি কয়েকজনের ক্ষীণ সম্বন্ধ কিংবা প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠেই বিশ্বাস উদ্ভিন শতকের চিন্তায় অতি প্রবল ছিলো। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯২০ শালে বাগিজের উন্নতি ও তিরিশে সংকট, ১৯১৭ সালে রুশ দেশের আখাস ও পরবর্তীকালে, অনেকের কাছেই বিশ্বাসভঙ্গ এবং অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সমস্ত পৃথিবীর যেন দুই বিরোধী শিবিরে বিভাগ, যেখানে সংশয়ান্বিত ব্যক্তির পক্ষ নির্বাচন অসম্ভব না হোক কঠোর—এ-সমস্ত ঘটনা অল্প রূপে, ছোটো আকারে পাওয়া যায় নেপোলিয়নের পতন থেকে বৃন্দে নেপোলিয়নের সিংহাসন-অরোহণের মধ্যবর্তী এই চল্লিশ বছরে। নেপোলিয়নের নির্বাসন যে স্বল্পকালের জন্য ইউরোপে স্থিতি আনে তা ভেঙে যায় জুলাই ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আলোড়নে। তখন হাইনে ছিলেন সমুদ্রতীরে, ভয়ঙ্কর উজ্জ্বলের আশায়। তিনি এতোই উৎসাহিত হন যে তৎক্ষণাৎ প্যারিসে এসে ব্যারিকেডে যোগ দিতে চান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আশাভঙ্গ হ'লো। বিপ্লবের আড়ালে বেনে জাতির অর্থলিপ্সা নিত্য নতুন প্রকারে প্রকাশ পেতো, এবং নিজের প্রত্যাশাকে তারা সামাজিক প্রগতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করলো। অতীতকে হাইনের মনে হ'লো শ্রমিক শ্রেণীও উপযুক্ত নায়কের অভাবে, বেনেদের যন্ত্রকীতি থেকে শুরু করে প্রগতির বৃষ্টি সমস্ত কিছু মনে নিয়ে এক বিশাল, নির্বোধ কিন্তু শক্তিশালী, পোষা জন্তুর মতো বণিকের ইচ্ছা সিদ্ধি করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছে।

এ-সময়ে দুটি ভিন্ন উপায়ে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তাদের স্বজন বলে উপস্থিত হয় ও তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে। সোশ্যালিস্ট আন্দোলন ও সেন্ট সাইমনিজম উভয়ই হাইনেকে আকর্ষণ করেছিলো। দ্বিতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আধুনিক ক্যাপিটালিজম-এর সাদৃশ্য এতোই স্পষ্ট যে ক্যুনিজম এবং সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে এই দুই মতবাদের তুলনা না-ক'রে উপায়

নেই। এই দুই দলে গোড়ভুক্ত হতে গিয়ে আধুনিক বুদ্ধিজীবীর যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, হাইনের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রতি মুহূর্তে শুধু দলের জীবনেই জীবন্ত হওয়া হাইনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অকারণে, অজ্ঞানভাবে জোছালিস্টদের প্রতিবাদ করে তিনি নিজের ও অল্প প্রত্যেকের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তিনি গোষ্ঠী-অতীত, স্বতন্ত্র জীবনের অধিকারী।

কিন্তু সেন-দশকের সঙ্গে এ-যুগের প্রধান মিল এই সমস্ত ঘটনায় নিহিত নেই। ১৮৫০ সালে বিপ্লবের ঐতিহ্যের, যেন অকস্মাৎ, যে-বিলোপ লক্ষ্য করি তা যদিও বিশ্বয়করভাবে আধুনিক অভিজ্ঞতার অল্পরূপ, তাহ'লেও, এমনকি এই ঘটনাদিগেও, এ-যুগের সবচেয়ে স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে না। সেকালে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার অর্থ মনে হয় যেন পৃথিবীর ভাগ্যের প্রতীকী অর্থ, যেন কোনো ঐতিহাসিক কালের ঘটনা নয়—বরং পুরণ-কথিত কোনো কাহিনীর অপভ্রংশ,—জটিল প্রত্যেকের সাহায্যে প্রকাশিত এক ভবিষ্যৎবাণী বা তৎকালীন ফরাসী কাব্যের রূপই শুধু বদলে দেয়নি, যেন অবচেতনায় নিহিত থেকে প্রত্যেক ফরাসীর বোধকেই সিক্ত করেছিলো। প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সাহুল্যের কালে হঠাৎ যেমন উদ্ভিনশো তিরিশের অর্থনৈতিক সংকট অপ্রস্তুত ধনাত্মিক সমাজকে ভাসিয়ে দেয়, ও পরবর্তীকালে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই যেমন উপস্থিত সাহুল্যের কৃষ্ণক ভুলে নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়ে, তেমনি এক আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এক প্রকৃতিক দুর্ভোগ ১৮৩২এ প্যারিস শহর আক্রান্ত করে। তারপর থেকেই যেন ফরাসী কবিতার প্রকৃতি পরিবর্তিত হ'তে শুরু করে। এরপর ফরাসী কবিতার, অন্তত তার শ্রেষ্ঠ দূরদৃষ্টগণিত, নিশ্চিন্ততা বিলুপ্ত হয়, প্রগতির পরিবর্তে সেখানে বাসা বাঁধে প্রকৃতির অন্তরে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অস্তিত্বের চেতনা।

এ-কথা সত্য নয় যে সেই প্লেগই সমস্ত পরিবর্তনের জন্য দায়ী; ফরাসী কবিতার ঐতিহ্যের নিজস্ব গতি ও সমাজ-সংস্কৃতির জটিল সহযোগে এই পরিবর্তন ঘটেছিলো। কিন্তু এই অদ্বুত দুর্ভোগ, টমাস মানের গল্পে ভেনিস শহরে প্লেগের মতোই, যেন স্ববিবর্ত অর্থের আকর ও গল্পের প্রায়শ্চেষ্ট দুই, সেই গল্পের অববাহিকার অরণ্যের মতো ধ্বংস—একদিকে মুছার ও রোগের, অতীতকে নিরস্তর প্রজননের প্রতীক। এর দু'বছর আগে রোমান্টিক যুগের



“এরনানি” নাটকটি কমেডি-ক্রাসেসে মঞ্চস্থ হয়। ফরাসী রোমান্টিকতার সেই ক্ষণটিই সবচেয়ে গৌরবের। কিন্তু যুগের প্রতিষ্ঠানভেদে সন্দেহ-সন্দেহই ফরাসী তরুণেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে। প্লেগের সময় যুগের আলো ছিলো, কিন্তু পূর্বের আঁচ তখন ফুরিয়ে গেছে। এর পর থেকে রোমান্টিকতা আর অগ্রবর্তীদের ব্যক্তিগত অধিকার রইলো না। তারা তখন রোমান্টিকতা ছাড়িয়ে আরো দূরে যাবার চেষ্টা করছে। প্লেগের কালে বাস্তববাদ ও আধুনিকতার যদিও অল্পর শুধু প্রকাশিত হ’লো, তবু সেই স্বপ্ন স্বপ্নকে ঘিরেই সবচেয়ে অগ্রগামী এবং সবচেয়ে নির্ভীক শিল্পারা একত্রিত হলেন।

এই প্রতীকী প্লেগের চিহ্নগুলি অনেক আগে থেকেই হাইনে তাঁর অল্পে ধারণ করেছিলেন। তাঁর কবিতা যখন থেকে তাঁর স্বকীয় হ’লো তখন তিনি অনেক প্রলোভন সত্ত্বেও রোমান্টিকতা পরিত্যাগ করেছেন, বাইরনিক ছদ্মবেশ পরিহার করে হ’য়ে উঠেছেন ব্যঙ্গনিপুণ। এবং শুধু রোমান্টিকতার বিরোধেই নয়, আধুনিক চেতনার প্রকাশেও তিনি অগ্রণী ছিলেন বলা যায়। তাঁর ‘বিকিনি’ কি বোদলেয়ারের ‘ভ্রমণ’ (Le Voyage) কবিতার উৎস নয়? ১৮৩০-২৪-এ তাঁর রচনা ‘নরকের সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত অধিরাজ’ বিষয়ে ‘প্যারিস-সঙ্গীনের সন্ধ্যাজনন কি?’ এমনকি বোদলেয়ারের মধ্য দিয়ে তিনি কি র‍্যাবাকে সাহায্য করেন নি?

স্মরণ্য অপ্রস্তুত পাঠকে হাইনের আধুনিকতা মেনে নিতে হয়। কারণ প্রথম পরিচয়ে প্রমাণগুলি অস্বাভাবিক। যদি শুধু কাল গুণে কিংবা সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে কবি আধুনিক কি বারোক কি রোমান্টিক হন, তাহলে হাইনে আধুনিক। যদি ব্যক্তিগত জীবনেই শিল্পসৃষ্টির চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে তিনি আধুনিক। যদি রোমান্টিকতার পরবর্তী কালে আধুনিকতার বিকাশ হয়েছে বলে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচার আধুনিকতা হয়, তাহলেও তিনি আধুনিক। কিংবা আধুনিক কবিতাকে তিনি প্রভাবিত করেছেন বলে, কিংবা আধুনিক স্রবকারের উপযোগী গান লিখেছেন বলে, কিংবা নাৎসিদের বিরোধভাজন হয়েছেন বলে কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে প্রবাসী জার্মানরা তাঁর দ্বারা অল্পপ্রাণিত হয়েছেন বলে, কিংবা যখন তাঁর কালের অধিকাংশ জার্মান রোমান্টিক কবিকেই আজকাল অপার্থ্য মনে হয় তখন শুধু তাঁরই

কবিতা উজ্জ্বল আছে বলে তিনি যদি আধুনিক হন, তাহলেও তিনি তা-ই।

কিন্তু আধুনিক কবিতাই শুধু একালে গড়া যায় এমন তো নয়। আমাদের পিতামহীদের আমলের অলংকার একালের স্বপ্ন চোখে বড়ো ভারি মনে হয়, কিন্তু সে-অলংকার যদি শিল্প হতো, যদি যে-অল্প তাকে ধারণ করছে তার উপর এতো নির্ভরশীল না হ’তো তবে নিজ গুণে সে কালোত্তর হ’তে পারতো সন্দেহ নেই। সেকালের অধিকাংশ কবি রোমান্টিকতার যুগ ক্ষমতার অভাবে, কর্তব্য-বোধে রোমান্টিক ছিলেন; রোমান্টিকতার সংজ্ঞাযুগারী উচিত কবিতা লিখতেন, চতুর অলংকার-রচয়িতা তাঁরা। কিন্তু রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধাচারই কি আধুনিকতার লক্ষণ? আধুনিক চেতনাকে কি রোমান্টিক বোধেরই এক চরম প্রকাশ বলা চলে না? রোমান্টিকতা, বাস্তববাদ, আধুনিকতা—পর-পর এই ধাপগুলি কি পূর্বনির্ধারিত পরিবর্তনের স্তরবিশেষ?

হাইনের জীবন ও জীবৎকাল আধুনিক উদ্ভাসে বিবৃত প্রতীকী ঘটনার মতো। কিন্তু তাঁর কাব্যের বেলায়ও কি সেই তুলনায় গুণ লক্ষ্য করা চলে? হাইনের সন্দেহ বাদের আমার মতো, শুধু অল্পবাদের ভিতর দিয়ে পরিচয়, তাঁদের কোনো কবিতার ভাষায় ব্যবহার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না-করাই প্রেম মনে হ’তে পারে, তবু যখন এমনকি অল্পবাদেও গেরগে কি রিলকের সন্দেহ তাঁর ভাষার ব্যবহারের প্রভেদ এত স্পষ্ট যে আমরাও সে-বিষয়ের মতামত প্রকাশ করতে পারি। হাইনের রচনার প্রধান গুণটি হ’লো এই যে কোথাও কোনো উপমা স্বনির্ভর নয়; কোনো বুদ্ধিগ্রাস্ত ভাবকে হৃস্পষ্ট ক’রে তুলতে, কিংবা স্বন্দর করতে, কিংবা পাঠকের কাছে তার আকর্ষণ বাড়ানোর জ্ঞান তিনি উপমা ব্যবহার করেন। উপমাগুলি যেন অস্বনিহিত ভাবার্থের টীকাবিশেষ। এখানে স্বপীক্ষনাথের অল্পবাদ থেকে সংগৃহীত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

“সাম্রাট কিছুই নেই জগতে; হুট সবাই দোবে।

গোলাপ আপন বোটা-বোটায়ে তীক্ষ্ণ কাঁটা পোবে।

সন্দেহ হয় উর্ললোকে দেবতা থাকেন যতো

হয়তো তাঁরাও বাদে ভরা মর্ত্যবাসীর মতো।

কিংসুকে, কই, সৌরভি নেই, বৃন্দাবনে তাপ,

গেরগা দিয়ে সাধু ঢাকেন মহাবিশ্বের ছাপ।”

হাইনের প্রথম প্রণয়পাত্রী আমানী, তার ছোটো বোন টেরেসাকে লেখা একটি কবিতার শেষ চার লাইন :

“কিন্তু ধরলো মরা ডালে ফের শীঘ্র।

স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয় বট তবে ?

তবু গুট কতে চোঁয়ায় স্মৃতির বিষ

তাকালে তোমার ভরুণ মুখাবয়বে। (স্বধীক্ষনাধস্তের অলুবাদ)

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। স্বধীক্ষনাত্মক যদিও উপমাগুলি ঘরের কাছাকাছি বস্তু দিয়ে সাজিয়েছেন, তবু যেখানে উৎপা না নেই সেখানে তিনি তা বসিয়ে দেন নি; কিংবা যেখানে চিত্রকল্প ঘনবদ্ধ ছিলো সেখানে ভাবের জল মিশিয়ে পাংলা করেননি। আমাদের মনে ভাব্য দেওয়া হয়েছে, গোপন উপমেয়গুলিকে অন্ধকার থেকে টেনে এনে আলোক-লাঙ্ঘিত করা হয়েছে ব'লে যে-সন্দেহ, তা থেকে অলুবাদকে নিঃসন্দেহে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। এই রচনাভঙ্গির দায়িত্ব হাইনেরই নিজের। তাঁর ধারণা ছিলো যে কবিতার কাজ হ'লো ব্যক্তিগত অহুভূতির বাহু প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করা, তাকে সর্বজনবোধ্য রূপ দেয়া। অনেক সময়েই তাঁর কবিতা-গুলিকে বিস্তারিত “poetic fallacy” ব'লে মনে হয়। অথবা অজ্ঞত বাহ্যিক জগতে কোনো ঘটনা দেখে তিনি অন্তর্জগতে ভুলনীয় কিছু দেখেন, তখন কবিতাটি হ'য়ে ওঠে বাহির ও ভিতরের সমান্তরাল কাহিনীর বিবরণ, বাইরের সঙ্গে অন্তরের মিল কিংবা প্রভেদের টানে কবিতাটি দাঁড়িয়ে থাকে।

কোনো আধুনিক কবি কবিতায় চিত্রকল্পকে এ-ভাবে ব্যবহার করেন না। চিত্রকল্প তাঁদের কবিতায় কোনো যুক্তির ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক উদাহরণ নয়, চিত্রকল্পই অর্থ, চিত্রকল্পের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্তনই এক ধরনের যুক্তি, চিত্রকল্পের সংকটই অভিজ্ঞতার সংকট। এখানে হাইনের সঙ্গে আধুনিক কবিদের আরেক প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। হাইনের যে-কোনো কবিতার প্রথম ছত্রগুলি যেন লেখা হয় শুধু শেষ কয় ছত্রের সংকল্পে পৌঁছবার জন্য। কবিতা-গুলি পড়তে-পড়তে মনে হয় শুধু শেষ ছত্রেই প্রথমগুলি অর্থ পাবে। যে-কোনো আধুনিক কবিতায় কবির ভাবা ও অভিজ্ঞতার যে-সংকট সূত্র হয়েছে, তা কখনো শেষের কয় লাইনের জন্য সঞ্চিত রাখা হয় না। আধুনিক

কোনো শিল্পকর্মের কোনো অংশবিশেষ সমস্তের অঙ্গ অংশের চেয়ে মূল্যবান নয়। অথচ হাইনের বেলায় প্রথম ও শেষের এই বিশেষ প্রভেদ আছে। “পরিবাদ” নামের যে-কবিতাটির কয়েক লাইন আগে উদ্ধৃত করেছি তার ভাবার্থ হ'লো যে সমস্ত কিছুই, তা যত উৎকৃষ্টই হোক না কেন, কোনো-না-কোনো দোষে কলঙ্কিত। কবিতাটি এই “সমস্ত কিছু”র এক বাছাই করা তালিকা। শুধু পরিণতিতে :

“তোমায়, দেবী, ভক্তি করি; কিন্তু তোমার ক্রটি

কত যে, তার হিসাব রাখি, কোথায় এমন ছুটি ?

ডাগর চোখে, শুধাও কি দোষ ? আছে কি তার শেষ ?

ঐ সমস্তল বৃকের তলায় নেই হৃদয়ের লেশ।”

সমস্ত কবিতাটি আসলে এই উপসংহারে পৌঁছাবার জন্য লেখা।

তাঁর কয়েকটি কবিতার প্রথম ও শেষ ছত্রগুলি উদ্ধৃত করছি। চারটি কবিতার প্রথম লাইনগুলি এমা লাজেরাস-স্কৃত অলুবাদে এইরকম :

(a) “All in gray clouds closely muffled”,

(b) “Marked is the likeness twixt the beautiful  
And youthful brothers,”.....

(c) “At times thy glance appeareth to importune.”

(d) “My heart, my heart, is heavy !

Through merrily glows the May.”

এই কবিতাগুলির শেষ লাইনগুলি যথাক্রমে :

(a) “And will sleep as Gods are Sleeping.”

(b) “The best of all is never to be born.”

(c) “Incurably thy heart must ache each hour  
for love frustrated and frustrated life.”

(d) “I wish he would shoot me dead.”

যে-কেউ, কবিতাগুলির মানের অংশ না-জেনেও, এই প্রথম ও শেষ লাইনগুলির মধ্যে উত্তাপের প্রভেদ লক্ষ্য করবেন। যেমন শেক্সপীয়ারের সনেটে প্রথম ছত্রগুলি অপেক্ষাকৃত নিরুতাপ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সুর হয় কিন্তু শেষ লাইনে সমস্ত সঞ্চিত অহুভূতির প্রাবল্য, বহুবর্ণ কিরণচ্ছটায় ফেটে



পড়ে, ভেমন হাইনের কবিতাও প্রথম দিকে কয়েকটি সংকেত জুগিয়ে শেষাংশে হৃতগুলিকে নিপুণভাবে একত্রিত করে বেধে দেয়। স্থানে-স্থানে নৈপুণ্য এতই বেশি যে আঠারো শতকের এপিগ্রামের মতো আটোশটো, নিখুঁত মনে হয়। বিতায়ত, আঠারো শতকের এপিগ্রামগুলির মধ্যে যে-সম্বন্ধতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকে তারও অভাব নেই। হয়তো এই কারণেই, জর্জানহুলত ভাবপ্রণতা থেকেও তিনি সহজেই মুক্তি পান তাঁর ভাবপ্রণতার সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধিজ্ঞ প্রতিবেশক জুগিয়ে। লয়েলেই-এর মায়াবী সংগীত ও তাঁর জীবনে আমালীর প্রভাবের করুণ দিকগুলি তিনি যেমন দেখতে পান, ভেমনি তার হাতকর দিক সম্পর্কেও তিনি সচেতন। প্রবীণ রোমান্টিকদের ভাবন, বিনাদ্বিধুর নিষ্প্রাপ্ততা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি নিজেকে নিজের দৃষ্টিতে দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বহির্জগতের সামাজিক দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেন। “স্বতিবিব” নামের যে কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছি তার সবচেয়ে বিষয়কর লাইনটি—“স্বাথো কি আমি অক্ষয়বট তবে”—নিজের সম্পর্কে যে-তীক্ষ্ণ বিক্রপ করবার ক্ষমতা রাখে তা নোভালিস-এর থাকলে তিনি এত অশ্রুসজল হতেন না, শেলির লেখায় থাকলে তাতে ছেলেমানুষির প্রাবল্য কমতো। তাঁর কবিতার আবেদন, আমাদের কাছে, ভাবাবেগের আড়ালে বুদ্ধির এই সর্বব্যাপী অস্তিত্বে। উত্তর সাগর প্রসঙ্গে কবিতাটির হটনায় তিনি যে ‘tiny morsel of reason’-এর উল্লেখ করেন তা প্রভাবে ও তীক্ষ্ণতার মোটেই লীণ কিংবা দুর্বল নয়।

হাইনের বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন আলোচ্য: কেন তিনি রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচার করেও আধুনিক হলেন না, কী করে রোমান্টিকতা আধুনিকতার রূপান্তরিত হয়েছিল ও সবশেষে যদিও তাঁর কাল আমাদের কালের উপম্যে, তবুও তিনি কেন আধুনিক ভাবের কবিতা লেখেন নি।

রোমান্টিকতার দুই দিক—ব্যক্তির স্বাভাব্য ও অনন্ততার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভাবার সৃষ্টিকারী ক্ষমতার প্রতি আস্থা—হাইনে এই উভয়েরই বিরোধিতা

“And as homage I dedicate to thee  
The tiny morsel of reason,  
That has been compassionately spared me  
By thy predecessor in the realm.”

করেন। নিজে অসুস্থতীর ঐতরূপ প্রকাশের ও নিজেকে দূর থেকে দেখবার ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করেন, তার মানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। রোমান্টিকতার পরিবর্তে বাস্তববাদকে গ্রহণ করেন তিনি; বাস্তববাদীদের মতো আত্মমুগ্ধ ও বিষয়মুগ্ধ সত্যের প্রভেদ স্বীকার করে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান থেকে যে-টানোর উদ্ভব হয় তারই ব্যবহার তাঁর কবিতার অঙ্গীকৃত।

কিন্তু আধুনিকতা রোমান্টিকতার বিরোধী নয়, বরং একদিক থেকে উভয়ে একই উৎস-জাত ও একই প্রক্রিয়ার, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরোধের, বিভিন্ন স্তর-বিশেষ। কবি যতকাল নিজেকে বিপ্লবী বলে জেনেছেন ততকাল ভাবার ক্ষমতা পরণ করবার স্রোযোগ (কোলরিজের কবিতা অবশ্য এর ব্যতিক্রম) তাঁর হয়নি। হাইনে, সাধারণত, বিপ্লবীর ভঙ্গি গ্রহণ করেন নি, হয়ত সে জেজেই ব্যক্তিগত জীবনে বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত প্রবল ছিল। যতদিন পাঠককে পরিবর্তিত করবার দায়িত্ব বড়ো ছিল ততদিন কবিতায় বাতীর মূল্য ছিল বেশি। কিন্তু আধুনিক কালে কবি এই দায়িত্ব থেকে ছুটি নিয়েছেন বলে কবিতাকেও পাঠক স্রষ্টার অধিকার থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

কী করে রোমান্টিক কবিতা আধুনিক কবিতায় রূপান্তরিত হ’লো, সে-ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ। রোমান্টিক রিভাইভাল-এর শেষদিকে ব্যক্তি তার-স্বাতন্ত্র্যের উৎসার অস্বস্তিকান না-গিয়ে তার প্রকাশভঙ্গির প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। আকিং, অদ্ভুত বেশভূষা, নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি—এই লক্ষণগুলি অনেকের কাছে অন্তর্নিহিত অর্থের চেয়ে মূল্যবান মনে হ’তো। আবার অনেকে, স্বেচ্ছাভাবে, ওইগুলিকে রোগের দল্লক্ষণ মনে করেন, এবং রোগমুক্তির উপায় হিসেবে ব্যক্তিকে তার সংকীর্ণ বোধ থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক চেতনার বিশ্বজনীনতায় প্রবেশ করতে বলেন। কিন্তু কবির সমস্তা প্রধানত রোগমুক্তি নয়, তাঁর সমস্তা কী করে এই পুরোনো, বহুব্যবহৃত লক্ষণগুলিকে অতিক্রম করে কিংবা তারই সাহায্যে সত্যকার নতুন কবিতা লেখা যায়। যেসময়ে জর্জ সা সমাজচেতনায় রোগমুক্তির উপায় প্রদর্শন করলেন, ঠিক সেই সময়েই বোল্‌লেয়ার তাঁর মৌলিক শিল্পনৈতিক হুসাহসিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। রোগ কিংবা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরোধকে অস্বীকার না-করে, বরং

তীব্রভাবে তাকে যেমন নিয়ে, তিনি চাইলেন রোগাক্রান্ত মনের অভ্যস্তের  
এবেশ করতে। কারণ সম্ভার সমাধান কবিত্বতা নয়; তাঁর কর্তব্য, নিজেকে  
ক্ষয় করেও যদি হয়, উপস্থিত সত্যকে শিল্পের মধ্যে বিকশিত করা।  
তাই আধুনিক কবিরা মিসেস ব্যাডরিক্স, পো এবং কোলরিজের মধ্যে পুষ্টির  
সঞ্চয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। অম্বচ বারো বিপ্লবের জল-হাওয়া  
বহিত হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার অসারতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, শিল্পাতীত  
জন্মের দিক দিয়ে হযতো বারো অজ্ঞানের চেয়ে খাটো নন, বিপ্লবের জোয়ার  
চলে গেলে সেই সব শেলীপঙ্খী চাঁটসিঁ কবিরা—টমাস ওয়েড, টমাস হুপার  
জেরাল্ড ম্যাসী, এবেনেজার এলিয়ট প্রমুখ কবিকুল—অহঙ্ক জলের অভাবে  
তীরের বালিতে সমুদ্র-পরিভ্রমক জন্মের মতো আজ শুকিয়ে গেছেন।

কবিতার ঐতিহ্যের নিজস্ব যে এক গতি আছে তার স্বীকৃতি আমাদের শেষ প্রশ্নের উত্তর জোগাবে। জগতের বর্ণনা শিল্পকর্ম নয়, জগতের অস্তিত্ব কবির ভাষাচেতনায় যে-প্রতিক্রিয়া জাগায় ও সেই আলোড়নের ফলে যে-গড়নটি বেরিয়ে আসে, তা-ই শিল্প। যদি জগতের বর্ণনা করা শিল্পীর দায়িত্ব হ'তো তবে তুলনীয় ঘটনা তুলনায় শিল্পের জন্ম দিতো। কিন্তু আমাদের মন যে-আকারে প্রসব করে তা নির্ভর করে মনের তৎকালীন ভাষাচেতনায় উপর, কবিতার ঐতিহ্যের সেই মুহূর্তের পূর্ববর্তী শিল্পকর্মগুলি থেকে আহৃত ধারণার উপর। এই প্রসঙ্গে বিতর্কটি এত পুরোনো ও জরুরি যে শিল্প-অভিযুক্ত উদাহরণ মনে জাগে। মার্গারেট মীড তাঁর একটি বইয়ে তিনটি প্রাচীন জাতির আলোচনা করেছেন যাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ভৌগোলিক পরিবেশ একই, কিন্তু তৎসময়ে তারা তিনটি ভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। জম, মুঠা, লোকান্তবোধ, ধর্ম, সমাজে নারীর স্থান, বয়সসম্মিলকালে ভরূপ-ভরূগীর নিয়ন্ত্রণ, সমাজে কর্মী পুরুষ ও নিষ্কর্মী বৃদ্ধদের সম্পর্ক—প্রত্যেকটি সমস্যা সম্পর্কেই ভিন্ন-ভিন্ন উপায়ে এই তিনটি সংস্কৃতি সমাধান খুঁজিয়েছে। যদিও একই ভিত্তির উপর সমাজগুলি স্থাপিত তবু জীবনকে ভিন্ন-ভিন্ন আকারে তারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঠিক তেমনি আধুনিক জীবনের অমূরূপ সমস্যা বিভিন্ন রীতি ও বিভিন্ন ঐতিহ্য নিশ্চয়ই ভিন্নভাবে সমাধান ও রূপায়িত করবে। হাইনে যেকালে জন্মেছিলেন সেকাল হয়তো আধুনিকের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু

ইউরোপীয় ইতিহাসের যে-ক্ষেণে হাইনে জন্মেছিলেন সে-ক্ষেণে আধুনিক শিল্প ধারণার প্রতিকল্প পূর্ববর্তী শিল্পকর্মগুলি থেকে আহরণ করা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু স্বপ্নের বিষয়, আধুনিক হাওয়াটাই একমাত্র মাদণ্ড নয়। ১৯৫৬ শালে লেখা না-হ'লেই যাদের কাছে কবিতা পাঠ্যযোগ্য হয় না তাঁদের অজ্ঞ হাইনে কোনো যুগোপযোগী বুলি, কোনো প্রিয় মিথ্যাচারের ব্যবস্থা রাখেননি। এমনকি, একালের কবিদের সবচেয়ে যা পবিত্র চিন্তা অর্থাৎ কবিতা ও শিল্পের চরিত্র আলোচনা, তা-ও তিনি করেননি। তিনি একস্থানে লিখেছেন যে, তাঁর প্রথম যৌবনে অন্তত, কাব্যচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো তাঁর প্রশংসার্তী আমালী হাইনের মনোযোগ আকর্ষণ ও ঈর্ষার উদ্বেক করা। যে-ভাবে পুরুষ-পারিত্রা পুঙ্খের বর্ণাঢ্য গৌরবের দ্বারা পক্ষীর্ণর হৃদয়-হরণ করে। কোনো আধুনিক কবির সম্পর্কে একথা বললে তিনি যদিও অপমানিত বোধ করতেন, অজ্ঞ এক সং কবির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনলে তিনি হয়তো অপ্রীতি হতেন না। রবীন্দ্রনাথও “ক্ষণিকায় কবিতাকে বিপদকালের দীন সঙ্ঘী বলে অভিহিত করেছেন; “ভাগ্য যবে ক্লপণ হয়ে আসে/ বিশ্ব যবে নিঃশ তিলে তিলে/ মিষ্টি মুখে ভুবন ভরা হাসি/ ওষ্ঠশেষে ওজন দরে মিলে” তখনই শুধু “কথার সাথে গাঁথো কথার মালা/ মিলের সাথে মিল মিলো ও মিল।” কিন্তু যদি “অরুণ চোখে তরুণ কোটে হাসি” তখন বাতা গোড়াও, ক্ষ্যাপা কবি, নিম্নের সাথে মিল লাগাও দিল। “ক্ষণিকা”র সঙ্গে হাইনের শিলাচরের অনেক তুলনীয় গুণ লক্ষ্য করা চলে। “ওষ্ঠশেষে ওজন দরে হাসি” এই লাইনটির চতুর হাওয়ার, নিজের করুণ অবস্থা সম্পর্কে আশ্চর্য খন্ড দৃষ্টি ও স্বাভাবিক বাচনভঙ্গির মধ্যে হঠাৎ ঐ “দিল” শব্দটির আয়দানি থেকে অহুসদ্বান করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ হাইনের রহস্ত জানতেন।

এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কারো অবশু হাইনের কবিতার অংশীদার থেকে সোজা হুজি পুটি আহরণ করবার ক্ষমতা ছিল না। কারণ নিজেকে ও শিরকে এভাবে অতিক্রম করতে গেলে নিজের ব্যক্তিত্বের শিকড়কে কোনো শির-অতিরিক্ত ও ব্যক্তি-অতীত গভীরে প্রবেশ করতে হয়। অতীতকে আধুনিক শিল্পীকে হাইনে যেমন কিছু বিষয়, কিছু অপরিণত উপাদান জুগিয়েছেন, ঠিক তেমনি ষোড়শ শতাব্দীর ও আশিষ্যের বিরুদ্ধে সাবধান করে দিয়েছেন।



নিজের শিল্পকর্মের মধ্যে রোমাঞ্চিক বিবক্ষাচারের সমস্ত সম্ভাবনা নিশেষ করে দিয়ে আধুনিক কবিকে অল্প দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বাধ্য করেছেন। তিনি যেভাবে নিজের ক্ষমতা তবিশুদ্ধকৈ পুঁই করেছেন, তাঁর জীবনের শেষ কয় বছর যেন তারই প্রতীক। এগারো বছরের মধ্যে তাঁকে তিনবার চিকিৎসকেরা জানায় যে মৃত্যু তাঁর আসন্ন। কৌনিজ পাঁচ যেমন তার চিত্তার মধ্য থেকে উঠে আসে, তিনি তিন বার তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকে উখিত হন।

অন্য কোনো দৃষ্টান্ত হিসেবে নন, আধুনিক কবিতার প্রশান্তির উপলক্ষ্যে কিংবা কোনো সাময়িক ক্যাশানের উৎস বলেই তিনি মৃত্যুবান নন। একশো বছর পরেও হাইনের কবিতা আমাদের আনন্দ দেয়। তাঁর মহত্বের প্রমাণ এই যে, তাঁর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা কবিতাটিতে বিবৃত মাছির মতো, আমরা একবার তাঁর কবিতা থেকে জীবন ও জীবন থেকে কবিতার উপর এসে বাঁসে পরিতৃপ্তির কোজ আচ্ছন্ন সংগ্ৰহ করতে পারি।

## ডিলান টমাস

(১৯১৪-১৯৪৩)

মহেশ গুহ

অবিবাহিত মণ্ডপানজনিত বিষের জিরা থেকে অট্টোক্ত অবস্থায় মাকিন হাসপাতালে ডিলান টমাসের মৃত্যু হোলো। ইয়েটস-এর পরে ইয়েরজি লিরিক কবিতার তাঁকে আমরা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে মনেছিলাম। চল্লিশ না-গেরোভেই তাঁর এই অপরূপ তাই কঠিন শোক হয়ে বিপদে। কারো কারো অস্থান এ-মৃত্যু খেঙ্কাকৃত। প্রবীতির বীরা প্রতিপালক তাঁদের মিত্তার সঙ্গেও বলব—তিনি বৈতে থাকলে প্রবী হতাম, কিন্তু তাঁর মতো কবির পক্ষে আর কোনো মৃত্যুই যেন মান্যো না।

আমাদের কালে যৌবনেই কবিদের অবলম্বন প্রজ্ঞাপ্রস্থান। হয় তাঁরা কবিতায় মানুষের উপকারসাধনে বঙ্গবিরক, নহতো ছুঁপ পেশল পৃথিবীতে শিল্পের স্বরাজ্যস্থাপনে প্রমণীল। তাঁদের অম্যবসায় প্রশংসনীয়, তাঁরা ভাবুক, তাঁদের করুনা সংচিন্তার অন্তর্গামী। কিন্তু আরো একশ্রেণীর কবি আসেন পৃথিবীতে, জীবনকে ভালোবাসলেও দুর্ব্যারোগ্য নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় জ্বলতে-জ্বলতে ফুরিয়ে যান বীরা, আমরা বীাদের চরিত্রকে ঠিক সামাজিক আদর্শ বলে গণ্য করতে পারি না, সংগ্ৰহ করি, কখনো যুগা করি, বলি উদ্ধৃত, দুর্বিনীত, নির্দয়,—কিন্তু অসহায়,—কখনো বলি সমাজের শত্রু। যাকিছু প্রচলিত সংস্কার তাকে তাঁরা হেলায় উপেক্ষা করে চলে যান, এবং কোনো শর্তেই পৃথিবীর সঙ্গে সন্ধি হয় না তাঁদের। প্রথম দলে যদি এলিঅট, অডেন, শিয়ার দলে রেক, র্যাণো, ইয়েটস, ডিলান টমাস। প্রথম মহাপুরুষের অপরান্নে বাল্যকাল, এবং তিরিশের যুগের অর্থনৈতিক সংকটায় অনবসর ওয়েলস এদেশে কৈশোর কাটালেও ডিলান টমাসের কবিতায় সমাজ-হিতৈষণার অভাব বিশ্বাস্যকর। কেন তিনি কাব্যচর্চায় নিরত, তাঁর কারণে দেখিয়ে বলেছেন:

"These poems, with all their crudities, doubts, and confusions, are written for the love of Man and in praise of God, and I'd be a damn' fool if they weren't."

অজ্ঞাত এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলেছেন কবিতার :

Not for the proud man apart  
From the raging moon I write  
On these spindrift pages  
Not for the towering dead  
With their nightingales and psalms  
But for the lovers, their arms  
Round the griefs of the ages,  
Who pay no praise or wages  
Nor heed my craft or art.

সমসাময়িক কবিকুলের সঙ্গ্যেই নয় শুধু, ইরেজি কাব্যের কোনো ঐতিহ্যের সঙ্গ্যেই এ-কবিতা মেলে না। সাম্প্রতিক কবিতার তির্যক বিচাঙ্গে অভ্যস্ত যারা, তাঁদের কাছেও ডিলান টমাসের বেশির ভাগ কবিতা অস্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ লাগতে বাধ্য। কিন্তু সব দুরূহতা আর অভিনবত্ব নিয়েও আধুনিক মনের এমন কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই তিনি মেটাতে পেরেছিলেন, যার ফলে শুধুমাত্র সমব্যবসায়ী মহলেই তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়িয়েছে তা নয়, বাইরে বৃহৎ জনতার মধ্যেও তা চেটে জ্বলছিল। মার্কিন দেশে তাঁর কাব্যপাঠের সভা থেকে অল্পপণ বেগে অর্থাগমের এরকম মানে করলে ডল হবে যে লোকেরা তাঁর দেবদূতের মতো দেহসৌষ্টব দেখতে অথবা কিম্বদন্তীর আবৃত্তি শুনতেই শুধু ভিড় করতো। দেখতে তিনি স্পুরুস ছিলেন নিশ্চয়ই। এবং ও-গুণ যদিও কোনো অজ্ঞাত কারণে কবিমাত্রেরই অস্বাভাবিক উপস্থিত, তিনি আরো বেশি কাস্ত্রিয়মান ছিলেন সন্দেহ নেই। এডিস সিটওয়েলের প্রোচ বয়সী চোখকে যদি বিশ্বাস করি :

He was not tall, but extremely broad. and gave an impression of extraordinary strength, sturdiness, and superabundant life. (His reddish amber curls, strong as the curls on the brow of a young bull, his proud, but not despising, bearing, emphasised this.) Mr. Augustus John's portrait of him is beautiful, but gives him a cherubic aspect, which, though pleasing, does not convey, to the present writer at least, Dylan's look of archangelic power.

কিন্তু নিছক দেহসৌষ্টবই কোনো কবিকে আমাদের প্রিয়জনে পরিণত করতে পারে না। আমরা তাঁর কবিতাকে ভালোবেসেছিলাম, কেননা সে কবিতায় যে-স্বাধীন স্বতন্ত্র জগতে স্বতন্ত্র পাই, পরিচিত বহির্বিষয়ের সঙ্গে তার যোগ যদিও নামমাত্র, তবু ভ্রমণের ফলে অভিজ্ঞতার এক অপূর্বতা নিয়ে ফিরে আসি আমরা। সেই অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত মনের মধ্যে হানা দিয়ে ফেরে এবং তার প্রভাবে জীবনকেও আমরা অজ্ঞাত ভাবে ভালোবাসতে শিখি।

18 Poems নামে তাঁর প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল ১৯৩৪ শালে। তার বারো বছর পরে চতুর্থ এবং শেষ বই বেরোর Deaths and Entrances। যুক্তার আগের বছরে প্রকাশিত তাঁর সমগ্র কবিতার সংগ্রহে এই বারো বছরে লেখা ৮৪টি কবিতা ছাড়া শুধু একটি মুখবন্দ এবং পাঁচটি রচনাকে তিনি স্থান দিয়েছেন। কলাকৌশলের দিক থেকে মুখবন্দ এই কবিতাটিতে একটি আশ্চর্য ধৈর্যশীল পরিশ্রমী কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৪২ লাইনের এই কবিতায় ৫১ আর ৫২ লাইনের পদ্যগুলি মিল সব চাইতে নিকটবর্তী। বাকি মিল সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে আরম্ভ এবং শেষের দিকে ক্রমে টেডয়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে প্রথম পদের মিল দিয়েছেন তিনি কবিতার সর্বশেষ পদের সঙ্গে। এবং আশ্চর্য এই যে কলাকৌশলে অত্যধিক মনোনিবেশের পরিণামে রচনাটি নিছক অহুশীলনে পর্যবসিত হয়নি, কবিতাই হয়েছে। সংগ্রহে বজিত কিছু বালা এবং কৈশোর রচনা ইত্যন্ত ছড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কবি নিজেকে বাদ্যের রক্ষণযোগ্য বলে স্বীকার করেছিলেন তার প্রথম কবিতা থেকেই পার্থক্যে ধাক্কা খেয়ে চোখ-কান সজাগ করে জুগলত হয়। অধিকাংশ কবিতায়ই স্বতন্ত্র কোনো নাম নেই, প্রথম পঙ্ক্তিকেই নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কদাচিত্ব নাম দেওয়া থাকলেও Poem in October কিংবা Poem on His Birthday ধরনের নাম থেকে কবিতার উদ্দেশ্য অস্বাভাবিক করা কঠিন। তবে অজীবের তাঁর জন্মদায়, আর সেই জন্মদায়কে অবলম্বন করে লেখা কবিতার সংখ্যা থেকে বোঝা যায় জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর অদৃশ্য গোপন আর রহস্যময় প্রক্রিয়া তাঁর কবিতাচিন্তাকে কতদূর আচ্ছন্ন করে ছিল। ডিলান টমাস নরনারী প্রেমনির্মে কবিতা লেখেন নি। প্রেমের রূচিৎ এসঙ্গে তাঁর কবিতা বরং বিজ্ঞপে



শানিত হয়েই উঠেছে, যার প্রাথমিকরূপ 'Our eunuch dreams' কবিতার  
একাংশ জুলে দিই :

In this our age the gunman and his moll,  
Two one-dimensioned ghosts, love on a reel,  
Strange to our solid eye,  
And speak their midnight nothings as they swell ;  
When cameras shut they hurry to their hole  
Down in the yard of day.

তার কবিতার প্রকৃতির বর্ণনা নেই, বলতে গেলে কোনো কিছুই তন্ময়  
বর্ণনায় তিনি আগ্রহ দেখান নি। জীবন নামক এই যে আবদ্ধ অস্তিত্বটুকু,  
মাতৃগর্ভবাসেরও পূর্বে এবং মূলিকণায় পর্ববসিত হওয়ার পরেও যার জটিল  
গ্রহি কিছুতেই খোলে না, তার স্বরূপ কল্পনাতেই তাঁর জীবন কেটে গেল।  
18 Poems-এর অন্তর্গত প্রায় সব কবিতার প্রসঙ্গই জন্মমৃত্যুর প্রক্রিয়া। তা  
ছাড়াও শেষ পর্বন্তই কবিতার পর কবিতার জন্মের, মৃত্যুর—বিশেষত মৃত্যুর  
প্রসঙ্গ উপস্থিত : And death shall have no dominion, After the  
funeral, A saint about to fall, If my Head Hurt a Hair's Foot,  
Twenty four years, A refusal to mourn the Death, Poem in  
October, Do not go gentle into that good night, Over Sir John's  
Hill, Poem on his birthday.

২

এমন নয় যে পর্ববক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ছিল না। কবিতার মতো গল্পে  
উপভাসেও তাঁর প্রধান উপাদান স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা। সেই সব চমকপ্রদ  
কাহিনীর বিতাসে আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে অপর চরিত্র, দৃষ্ট এবং ঘটনারও  
আশ্চর্য নিপুণ বর্ণনা দেখা যাবে। তাঁর গল্প রচনার ছন্দও সহজে ভোলবার  
নয়। কিন্তু গল্পের এই স্বচ্ছতার পরিবর্তে কবিতায় সবটাই বাগদা, যেন  
দূর-থেকে দেখা কুয়াশার পর্দা ঠেলে পাঠ্যভূতলির শহর আলোর বেরিয়ে  
আসতে গিয়ে পারছে না। সমসাময়িক আরো অনেকের মতো তাঁর

কবিতা ব্যক্তিগত কিংবা অজ্ঞাত উল্লেখ্যে কটকিত নয়। কিন্তু তাঁর বাক্য-  
যোজনা হ্রস্ব, ছেদচিহ্নের ব্যবহার নিয়মভাঙা, এবং শব্দের অনভ্যন্ত  
ব্যবহার সময়-সময় জয়স-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। বাধা হিসেবে এর  
কোনোটাও অবশ্য দুর্বল্য নয়। আসল বাধা উপস্থিত হয় তারও পরে যখন  
তাঁর ভাবনার আলো-জ্যোতির্বিদ্যে ঢুকে আমরা ধমকে দাঁড়াই। জানা পৃথিবীর  
কোনো মানচিত্রই সেখানে কাজে লাগে না। অথচ বুরতে পারি রুদ্রভয়ংকর  
অথচ কোমল স্নানর জীবনের এক পরম সত্য রূপ সেখানে উন্মোচিত হয়েছে।  
বাস্তবকে অবলম্বন করেই কবির কল্পনা কতদূর রূপান্তরিত জগতের রচনা কদমে  
পারে তার এক চরম দৃষ্টান্ত ডিলান টমাসের কবিতা। তুলনায় অডেন-এর  
কবিতা বুদ্ধি আর বিশ্লেষণের কাছে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

ডিলান টমাসের সমজাতীয় কবি বরং রেক,

that William Blake  
Who beat upon the wall  
Till Truth obeyed his call.

শব্দের প্রচলিত অর্থ আর ব্যঙ্গনা নিয়ে যার শেষজীবনের কবিতায় প্রয়োজন  
মেটেনি, ভাষাকে বেকিয়ে চুরিয়ে মস্ত বিপ্লবের কাণ্ড করতে হয়েছে। এই  
অবস্থার কথা বলতে গিয়েই রেক তাঁর এক বন্ধকে লিখেছিলেন :

'When I am Commanded by the Spirits then I write, and the moment  
I have written, I see the words fly about the room in all directions. It is  
then published. The Spirits can read and my MS is of no further use. I  
have been tempted to burn my MS, but my wife won't let me.'

রেকের চাইতেও ডিলান টমাসের নিকট আত্মীয় র'গ্যো। র'গ্যো  
মতোই তিনিও নির্দয় আত্মগীড়নের পথে তাঁর কবিপ্রতিভার মুক্তি খুঁজে-  
ছিলেন। বাহিরে রুদ্রতার আবরণে ছজনেই মনের মধ্যে শিশুর নিষ্পাপ  
কমনীয়তাকে লালন করেছেন, এবং ছজনেই মনের মধ্যে শিশুর রীতিনীতি  
মেনে নিয়ে কাব্যরচনা করতে বসেননি, তার জন্ম নির্ভর করেছেন তাঁদের  
বাস্তব মনোজগতের উপরে, তাঁর কঠোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কর্ণে  
নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে সেই মনোলোকে দুরারোহ স্নানরের ফ্লকে তাঁর  
ফুটিয়েছিলেন।

ঐতিহ্য থেকে যেজায় নির্বাসন না-নিলেই তাঁদের চরিত্রহানি ঘটতো। সাহানসী গ্রাম্য-শুলের মাননীয় শিক্ষকতনয় ডিলান টমাস তাই নীতি আর সংস্কৃতির কোণীজকে প্রাপপণে এড়িয়ে চলেছেন। শোনা যায় তাঁর হাতের নখ অসম্ভব নোংরা থাকতো, ভদ্র শোষাকআসাকেরও বড়ো ধার ধরতেন না। এবং অভিজাত মহলের সাহিত্যিক আড্ডায় বসে অনর্গল যে-সব কুকথার ব্যবহার করতেন তা সচবাচর জঙ্গসমাজে অল্পচার্য। হার্ভার্ডের মতো সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সাহাবান সাহিত্য আলোচনার পরিবর্তে তাঁর মূখে অশ্লীল রসিকতার গন্ধ পেয়ে একে-একে তাঁর সম্বন্ধ নাসভা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলেও শোনা যায়। এ ছাড়া মত্তপানে তাঁর কোনোকালেই রাস্তা ছিল না। বি. বি. সি থর্ড প্রোগ্রামে কবিতা পড়বেন : পাঠ শুরু হওয়ার বিশ সেকেন্ড আগে মাইকের সামনে তাঁকে মত্ত অবস্থায় নিদ্রিত দেখা গেছে। বেতার শ্রোতাদের ভাগ্য বলতে হবে যে, জাগিয়ে দেবার পর প্রায় নির্ভুলভাবেই সেদিনের কবিতা পাঠ তিনি শেষ করেছিলেন। শুধু কবিতার নাম পড়েছিলেন “শেট শিশিলিয়াস ডে” যদিও তার কারণ ভিন্ন। নির্ভুল ছন্দের সত্যক কবিকুলকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ড্রাইডেনকে তো নয়ই।

কিন্তু এ-তো ছবির উল্টো দিক। একে তুচ্ছ করাই উচিত। তাঁর মাকিন দেশ ভ্রমণের সাহিত্যিক ঘটক জন ব্রিনিন অভদ্র ভৎসরণতার সঙ্গে তাঁর যত কুকাঁতির কথাই খাঁস করুন না কেন, কবির স্ত্রী এ-বিষয়ে তাঁর যে-মত ব্যক্ত করেছেন সেটাই আমরা গ্রহণ করব :

“There is no such thing as the one true Dylan Thomas, nor anybody else ; but, necessarily, even less so with a Kaleidoscopic-faced poet.”

তাঁর মতো অস্থির প্রতিভাকে অল্পকালের জন্য ব্রহ্মদুষ্টিতে দেখে সুবিচার করা অসম্ভব। স্বীয় জীবনকে ইন্দন করেই তিনি তাঁর কবিতার আগুন জ্বালতে চেয়েছিলেন। রচনার মূল্য ভুলে জীবনের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সেটা অস্বাভাবিক হবে। নতুন ইংরেজ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। এবং নিজের কবিতায় তিনি এক দুর্লভ সিদ্ধি নাই যদি লাভ করতেন তাহলে তার অকালমৃত্যুর বেদনা ইংরেজি কাব্যে আর-একটি অবিস্মরণীয় এলেজির কিছুতেই উপলব্ধ্য হ’লে উঠত না, সিটওয়েল যে এলেজির উপসংহারে লিখেছেন :

... There, in the maternal

Earth, the wise and humbling Dark, he lies—

The emigrant from a forgotten puradise—

The somnambulist

Who held rough Ape-dust and a planet in his fist

Far from the empires of the human filth...

So, for his sake,

More proudly will that Sisyphus the heart of Man  
Roll the Sun up the Steep of heaven, and in the street

Two old blind men seem Homer and Galileo—blind

Old men that tap their way through worlds of dust

To find Man's path near the Sun.



## সমালোচনা

বুদ্ধদেব: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিখ্যাত। ১।\*

বুদ্ধ-প্রসঙ্গ: মহেশচন্দ্র ঘোষ। বিখ্যাতগ্রন্থ, বিখ্যাত। ২।\*

হিন্দু আইনে বিবাহ: তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিখ্যাতগ্রন্থ, বিখ্যাত। ২।\*

বিখ্যাত। ২।\*

বৌদ্ধধর্ম ভারতে উদ্ভূত হ'য়েও ভৌগোলিক ভারতবর্ষ থেকে উদ্ভিন্ন হ'লো কেন, ইতিহাসের এটি একটি বড়ো সমস্যা। তার কারণ কি হিন্দুর শোষণ-শক্তি, না বৌদ্ধের কোনো দুর্বলতা, কোনো রাজশক্তি, শব্দের প্রতিভা, না কি বৌদ্ধ বিহারে আত্মভেদ বা অবক্ষয়? এ-বিষয়ে পণ্ডিতেরা বহু প্রকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু কয়েকটা সাধারণ তথ্য প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছে আজ পর্যন্ত স্থাপিত: (১) বৌদ্ধধর্ম এ-দেশে না-থাকলেও বুদ্ধের স্থিতি এ-দেশে জীবন্ত, স্থাপিত; (২) বৌদ্ধধর্ম এ-দেশে না-থাকলেও বুদ্ধের স্থিতি এ-দেশে জীবন্ত, কেননা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অমর নিদর্শনে তা বিদ্যুত হ'য়ে আছে; (৩) বৌদ্ধধর্ম মনে করা, বা ভক্তি না-করা আধুনিক হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়; (৪) যেমন বুদ্ধ নিজেকে জৈন ঐতিহ্যের কাছে স্থগী, তেমনি পরবর্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ যেমন বুদ্ধ নিজেকে জৈন ঐতিহ্যের কাছে স্থগী, তেমনি পরবর্তী বৈষ্ণবেরা বৌদ্ধ মানসকে অংশত আত্মসাৎ করেছিলেন, এবং (৫) বুদ্ধের কোনো-কোনো ধারণার সঙ্গে বৈদান্তিক ধারণার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরো একটি কথা ভারতবাসীর সাধারণভাবে অজ্ঞাতবশ করে থাকে; সেটাই বেশি জরুরি, এবং ভারতে এই ধর্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বৌদ্ধধর্ম নগুণক; তার লক্ষ্য কেবল নির্গুণ, বা শূন্যতা বা অস্তিত্বহীনতা। ধর্মের কাছে মানুষের ছুটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা থাকে; প্রথমত, তা ভগবানের সঙ্গে তার একটি সখ্য স্থাপন করে দেবে; দ্বিতীয়ত, তা দেবতা বা সন্ত বা অবতারের রূপে তাকে দেবে এমন কোনো অক্ষয় আশ্রয়, যেখানে সে পূর্ণ ভক্তি অর্পণ করতে পারে। এ ছাড়া নীতিধর্মও ধর্মের অন্তর্গত, কিন্তু সেটা তার গোঁণ উদ্দেশ্য। মানুষ তার দৈনন্দিন ব্যবহারগত জীবন কী-ভাবে কাটাতে, সেটা সংহিতার (আধুনিক ভাষায় আইন) প্রদেশভুক্ত, ধর্মের মহত্তম সাধকতা সেখানে নেই। অথচ বুদ্ধের বচন অধিকাংশই নীতিধর্মের উপদেশ; তিনি ভক্তির কোনো পাত্র তুলে

ধরেননি, ভগবান বিষয়ে নীরব ছিলেন, এবং নিকাম কর্মের মতো কোনো স্ত্রুও দেননি, যাতে মানুষ তার কর্মকেই পূজা ব'লে জ্ঞান করতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম নগুণক; রবীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থটি এই কথাই প্রতিবাদ করছে। বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধকেই ভক্তির পরম আশ্রয় রূপে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলো, কোনো-একজন মানুষকে এমন পূর্ণ ক'রে দেবা পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম, এবং যীশুকে ভগবানের পুত্র রূপে ঘোষণা করার মধ্যেও হয়তো বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে—এই হ'লো রবীন্দ্রনাথের মত। ঋগ্বেদে ভগবান স্বতন্ত্র এবং পরিব্যাপ্তরূপে বিরাজ করছেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্মে অমিত বুদ্ধ আর ভগবানকে প্রায় অভিন্ন ক'রে দেবা হয়েছে, এই প্রভেদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে কোনো আলোচনা নেই। ভক্তি আর সর্বভূতে প্রেম, বৌদ্ধধর্মের এই দুটি দিক তাঁর রচনায় উজ্জলভাবে প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রেম বলছেন, বৌদ্ধ পরিভাষায় তার নাম অহিংসা, সেটাও নগুণক বস্তু, বৈষ্ণবের, গীতাঞ্জলির, মিস্টিকের প্রেম নয়। এই অহিংসার চায়সম্মত চরম পরিণতি কোথায়, জৈনদের মধ্যে এখনো তার উদাহরণ বিরল নয়।

অবশ্য 'বুদ্ধদেব' রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিকল্পিত কোনো গ্রন্থ নয়; বুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তিনি যা লিখেছিলেন বা বলেছিলেন, তাই সংগ্রহ ক'রে বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা হ'লো। তিনটি রচনা ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রণ, কয়েকটি খণ্ড-রচনাও স্থান পেয়েছে। অনিবার্য কারণেই, বইটিতে একটা অগোছালোভাবে এড়ানো যায়নি; অনেক পুনরুক্তি আছে, কোনো-কোনো প্রসঙ্গ আরম্ভ হ'য়েই অকস্মাৎ শেষ হ'য়ে গেছে। কোথাও-কোথাও বানান বিষয়েও সন্ধিহান হ'তে হয়; ৬২পৃষ্ঠায় 'এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অজ্ঞ জীবেরও, বোধে স্থান আছে'; —'শুধু' হ'লে কথা ছিলো না, কিন্তু 'শুদ্ধ মানুষ' লিখলে 'বিশুদ্ধ (পবিত্র) মানব' মনে হ'তে পারে; আমরা যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ (অন্তত উত্তর-জীবনে) 'only' বা 'also' অর্থে 'স্বতন্ত্র' ব্যবহার করতেন। এই বিভেদ বাংলা ভাষার পক্ষে উপকারী হয়েছে, একে আজকের দিনে প্রত্যাশার করা যায় না। 'আবিরূদ্ধ' এবং 'সম্প্রদায়' বানান দেবে আমরা মর্মান্বিত হয়েছি—এবং এতে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি থাকতে পারতো, তাও করনা করা আমাদের পক্ষে

হুসাধ্য। এই চক্ষুশূল উন্মলিত করার জন্ম আমরা বিশ্বভারতীকে আবেদন জানাই। 'সংগে', 'গংগা', 'অংগ' প্রভৃতি অশিক্ষিত বানান দেখে-দেখে আমরা এমনতেই ক্রান্ত হইয়ে পড়েছি, তার উপর রবীন্দ্রনাথের নাম যেন এই বিশৃঙ্খলার সমর্থন না করে।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও তাঁর দ্বারা উদ্ভূত মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০)-এর বৌদ্ধধর্মবিষয়ক রচনাবলী পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করে বিশ্ব-ভারতী একজন যোগ্য ব্যক্তির স্মৃতিকে যথাসময়ে যথাচিত্র সম্মান দিয়েছেন। পুস্তিকাটি তিন অংশে বিভক্ত; 'গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত', 'গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি' ও 'নির্বাণতত্ত্ব'। ধর্মশাস্ত্রে শুষ্কত্বের পক্ষে শেষ অংশটি সবচেয়ে মূল্যবান; তাতে উপনিষদ ও বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা আছে, বার পরিশেষে লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন যে 'নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই।' এই মতের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার মতো যোগ্যতা বর্তমান লেখকের নেই; কিন্তু বুদ্ধ যদি শুধু উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি করে থাকেন বা নামাস্তরে তার ভিন্ন প্রকাশ প্রণয়ন করে থাকে, তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায়। রবীন্দ্রনাথের একথাটা খুবই সত্য যে ধর্মকে জীবনের মধ্যে দেখতে হয়, শুধু শাস্ত্র পড়ে তার সত্যকে বোঝা যায় না। তাছাড়া, বৌদ্ধকে একান্তভাবে পাশিশাস্ত্রনির্ভর ভারতবর্ষীয় ধর্ম মনে করাও ভুল; আজকের দিনে তা যেখানে প্রাণ ও সৃষ্টিশীল, সেই দূরতর প্রাচ্যের জেন-এর কথাও ভাবতে হবে। ভারতবর্ষে নয়, আফ্রিকানী জাপানির প্রথিত জেন ধর্মেই বৌদ্ধ ধারণা সত্যিকার নূতন ভাবে বিকশিত হয়েছে, চীন-জাপানের চিত্রে ও কাব্যকলাতেও তার পরিচয় পাই; সেই ধারা বাদ দিয়ে বৌদ্ধধর্মের কোনো যথার্থ আলোচনা হ'তে পারে না। আলোচ্য গ্রন্থ দুটি পড়ে বাঙালি পাঠক অনেক শিখবেন, কিন্তু জেন বিষয়ে কোনো বাংলা গ্রন্থ এতদিনে রচিত হওয়া উচিত।

শ্রীকৃত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় যে-কোনো বিষয়কে সরস করে তুলতে পারেন, 'হিন্দু আইনে বিবাহ' তার ব্যতিক্রম নয়। পুস্তিকাটি অতীব সুখপাঠ্য, সেই সঙ্গে তথ্য বিষয়ে সারবান। মন্ত্র থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৪ শালের দ্বিরাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা-সংবলিত স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট : এই সবগুলি

বিধানের বর্ণনা অল্প পরিসরে পরিবেশন করার জন্য আইনের জ্ঞানই যথেষ্ট ছিলো না, লিখতে জানারও প্রয়োজন ছিলো। হিন্দু ধর্মের সনাতনী বলে অপবাদ আছে, কিন্তু এই পুস্তিকা তার পরিবর্তনশীলতারই একটি দলিল।

বু. ব.

## চিঠিপত্র

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপে,

'কবিতা'র গত চৈত্র সংখ্যার 'বাংলা সনেট' বিষয়ে শান্তিকুমার ঘোষের পত্রটি আলোচনার অবকাশ রাখে। বুদ্ধদেব বস্তুর সনেটের অভিনব স্বরূপ বলতে গিয়ে সনেট ও ছন্দ সম্পর্কে তিনি যে-সব উক্তি করেছেন, তা প্রায়ই অস্পষ্ট এবং বাংলা ছন্দের রূপভঙ্গি (pattern) অস্বাভাবিক নয়।

শান্তিবাবু লিখেছেন, 'তিন-তিন-দুই-মাত্রার বদলে এখানে তিন-দুই-তিন মাত্রার পর্বাদে নিশ্চয়ই বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে।' বৈচিত্র্য হয়তো প্রকাশ পেয়েছে কবির বাচন-ভঙ্গিতে, কিন্তু শান্তিবাবুর কি জানা আছে যে পর্বাদে তিন-দুই-তিন, এই অনিয়মিত মাত্রাবিভাজ্য বাংলা ছন্দে অচল? বাংলা ছন্দে ক্রমের বিভাজ্য নিয়মিত। জোড় মাত্রার পর দুটি বিজোড় মাত্রা, দুটি বিজোড় মাত্রার পরে জোড় মাত্রা, অথবা দুটি বিজোড় বা দুটি জোড় মাত্রা দিয়ে গঠিত হয় পর্বাদ। দুই-তিন-তিন, তিন-তিন-দুই, তিন-পাঁচ, তিন-দুই-চার ইত্যাদি মাত্রার ক্রমবিভাজ্যে বাংলা ছন্দের পর্বাদ গঠিত। অসম মাত্রার অনিয়মিত বিভাজ্য যে অচল, সে-সম্বন্ধে শ্রীকৃত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলা ছন্দের মূলতন্ত্র পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

'তিন-দুই-তিন' মাত্রার নমুনা হিসাবে শান্তিকুমার যে-পংক্তি উদ্ধার করেছেন, তাতে তাঁর অনভিজ্ঞতাই স্পষ্ট বলে মনে হয়। 'বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয়' এই পংক্তির 'বাসনা অপরিসীম'কে শান্তিবাবু বোধ হয় তিন-দুই-তিন মাত্রা দিয়ে পড়তে চান। কিন্তু 'অপরিসীম' দুই-তিন মাত্রার বিভক্ত নয়, সম্পূর্ণরূপে পাঁচ মাত্রা। আর 'বাসনা অপরিসীম'কে যদি ভেঙেই পড়তে হয় তবে দেখাবো 'বাসনা'র সঙ্গে 'অপরিসীম'-এর 'অ' যুক্ত হয়ে চার মাত্রা করে দিয়েছে।



শান্তিবাবু লিখেছেন, 'আঠারো মাত্রার পংক্তিবিংশিষ্ট সনেট (যার ঠাণ্ডে-ঠাণ্ডে বাইশ মাত্রার লাইনও চোখে পড়ে) থেকে আরম্ভ করে মাত্র দশ মাত্রার ছোটো নিখুঁত অনম্য সনেট পর্যন্ত প্রায় সব রকম উজ্জল উদাহরণ এখানে পাওয়া যাবে।' সনেটে আঠারো মাত্রার ঠাণ্ডে-ঠাণ্ডে যদি বাইশমাত্রার পংক্তি থাকে, তবে তাকে সনেটের প্রকরণে অভিনব এলেও, সনেটের মূল বৈশিষ্ট্য, সংহতি ও গাভীর নষ্ট হয়ে যায়। আর, ছন্দবৈচিত্র্য কি সার্থক সনেট রচনার আবশ্যিকতা করে? বাইশ মাত্রার পংক্তিতে প্রবর্তমান পয়ারের ঠাঁট চলে আসে, তাকে স্তম্ভ হয় সুরের, এবং বহুলাংশে লিরিকের ভাব এসে সনেটের দূর ভাবনা এবং সজ্জতা নষ্ট করে দেয়। আঠারো মাত্রার পংক্তিবিংশিষ্ট সনেট বাংলা ভাষায় চলতে পারে, তার বেশি মাত্রা আনতে গেলেই সনেট আর সনেট থাকে না, চতুর্দশপদী কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ছান্দসিকের বিশ্বাস (অবশ্য লিখিতভাবে অনেকেই তাঁদের মত পেশ করেন নি) বাইশমাত্রাকে এক পংক্তিতে ঠাসা চলে না। বাইশ মাত্রা এলে তা আর একপংক্তিবিংশিষ্ট থাকে না, অল্প পংক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশ্য এ-প্রসঙ্গ আলোচনাসাপেক্ষ এবং বর্তমানে বিষয়ের বহির্ভূত।

দশ-মাত্রার পংক্তিবিংশিষ্ট সনেটগুলিও অনেক সময় সনেট-মর্যাদা-সম্পন্ন হয় না। তার কারণ সনেটাকারের ব্যক্তিগত ও বৈশিষ্ট্য দশমাত্রার স্লগ পরিসরে স্থাপিত হতে পারে না। যে-সনেটে কবির ব্যক্তিগত অস্থায়িত্ব, সে-সনেট সনেট নয়, অল্প আর-কিছু। দশ-মাত্রার পংক্তি নমনীয়, কঠিন নয়। পংক্তি স্লগ না-হলে সনেটরচনা ব্যর্থ। দশ মাত্রার যে-sonnet-sequence রক্ষিত হয় না, তার প্রমাণ 'আউটলিশের শীতের জন্ম' কবিতাটির তিন নম্বর কবিতা। সনেটের পক্ষে চোদ্দ ও আঠারো মাত্রার পংক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট বলে ছান্দসিক এবং কবিতা মত দিয়ে থাকেন।

বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক সনেটগুলি আলোচনার অযোগ্য নয়। তাদের প্রকরণ এবং লিপিত্রুর্ভেদে অভিনবত্ব আছে, তা নিঃসন্দেহে মৌলিক, কিন্তু মৌলিক হলেই তার সাফল্য সর্বদা সন্দেহাতীত হয় না।

কার্তিক লাহিড়ী

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেশু,

আবার সংখ্যা 'কবিতা'র পুস্তক-সমালোচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। অধুনা-প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলির সমালোচনা-বিভাগে শুধু বিশেষত্ব-বর্জিত 'neither to bury Caesar, nor to praise him'-রীতি অহুসারিত হতে দেখা যায়, কিন্তু শ্রী জ্যোতির্ষের দস্তুর ঘৃণ্যহীন সাধুভাষণ বর্তমানের তরুণ কবিদের অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করবে আশা করলে অজ্ঞান হয় না। আমরা যারা মধ্যপন্থী সমালোচনার কুরুমতি প্রলেপকেই এককাল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত, এই লেখকের স্পষ্ট সত্যবাদিতা তাদের অনেকের কাছে পীড়াদায়ক হলেও প্রেরণামণ্ডিত হবে।

একথা হয়ত ঠিক যে বর্তমানে কবিশোপ্রার্থী তরুণদের অনেকের মধ্যেই সম্ভাবনা আছে, তবুও সিদ্ধির ক্ষেত্রে বেশির ভাগই তাঁরা ব্যস্ত। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় কিংবা খ্যাতির বিড়ম্বিত বাসনায় অনেকেই স্ব-স্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনোরূপ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন বোধ করেন না। যে নিয়ম, নিষ্ঠা এবং ধৈর্যশীল সংযম থাকলে স্রষ্টা তার স্রষ্টার স্বরভার মধ্যেও অর্থহীন হয়ে ওঠেন, তা অনেকেরই নেই। যে-সাহিত্য 'বনলতা সেন', 'সংবর্ত' বা 'পালা-বদলের' মতো কাব্যগ্রন্থে ভাষার, সেখানে এ-ধরনের ক্রমিক অবনতি দেখে নৈরাশ্য এড়ানো যায় না। কবিতা-লেখা শিক্ষার প্রয়োজন তাই স্বীকার না-ক'রে উত্থাপ নেই।

শ্রী দত্তের প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহার স্বচ্ছন্দে সম্ভব। বৈপ্লবিক ভাষাচেতনাই যে স্রষ্টার ক্ষেত্রে নতুন আলোকের সন্ধান দিতে সমর্থ, সাহিত্যের ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই। নির্বিকল্পচিত্তে এ-সত্য স্বীকার করে নিলে অনেক কবিই উৎকৃষ্ট হবেন। বিশেষ করে কবিতার একটি নিজস্ব মায়িক আছে। প্রতিভাশালীর হাতে কবিতা শুধুমাত্র শব্দের স্রুৎযোগ নয়, এক ইচ্ছাজালিক প্রভাব, যার বলে কবিতা এক লোকাতীত সত্যে সিদ্ধিত হয়। "অকবির ধারণা, শিল্পীর দায়িত্ব সাংবাদিকের, শিল্পের অনন্ততা তাই তার বোধগম্য হয় না, বক্তব্য ও প্রকরণের প্রভেদ তার কাছে এতই স্পষ্ট। সংকবি এর প্রত্যেকটি ধারণাকে অস্বীকার করেন, কারণ শিল্পকে তাঁর মনে হয় অজ্ঞাতপূর্ব চেতনার

ভাষার স্বভাবের সাহায্যে বিকাশ, শিল্পকর্মটি জন্ম নেবার পূর্বে যে-চেতনার স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব ছিল।”

অনেকে বলে থাকেন, বর্তমান যুগ শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অঙ্কুল নয়। কী কবিতা, উপন্যাস, নাটক—সব বিষয়েই আমরা এক decadence-এর সম্মুখীন। তাই কালাহুগতির দোহাই দিয়ে অনেকে কবিতার অনন্ত সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করতেই অভ্যস্ত। ফলে ‘রুস্তা জীবনবোধ’র প্রেরণা সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্যে ‘সীমার মাঝে অসীম’-এর কোনো চেতনা জেগে উঠছে না। জাগতিক কোনো পরিবর্তনের মুখোপেক্ষী হওয়া তাই ‘সমস্ত কুকবি ও অকবির’ আশ্রয়স্থল উপায়। “তারা আগে আবিষ্কার করেন যে জগতে পরিবর্তন ঘটছে ও পরে কবিতায় সেই পরিবর্তন বর্ণনা করেন। আর সংকবি শিল্পের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে পৃথিবীর ও পরিবর্তন হয়েছে বলে অনুমান করেন।” সার্বক শিল্প ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই সত্যই সন্দেহাতীতরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রী জ্যোতির্ষক দত্ত সংকবিদের কাব্যলক্ষণ বর্ণনান্তে যতি টেনেছেন এই বলে যে “অরবিন্দ গুহ হুমারীদের দেহের বা আত্মহত্যার বিষয়ে লিখতে সাহস পান, কিংবা দিলীপ রায় দৈহিক কামনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এজন্য তারা অনুমোদনযোগ্য।” বিষয়বস্তু সন্দেহে এ-ধরনের পক্ষপাতে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। কবিতার আধারনির্বাচনে শুচিবায়ু যেমন হস্তকর, তেমনি কোনো আধার তার নিজের কারণেই বরণীয় হ’তে পারে কি? বিষয় যা-ই হোক, রচনাটি কবিতা হয়েছে কিনা সেটাই বিচার্য হওয়া উচিত।

কলকাতা

স্বনীতিভূমার চট্টোপাধ্যায়

### সংশোধন

‘কবিতা’র গত আবার সংখ্যার ‘আধুনিক কাল ও বাংলা কবিতা’ প্রবন্ধে আলোচিত ‘তৃতীয় নয়ন’ গ্রন্থের লেখকের নাম পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কিন্তু ভ্রমক্রমে তা ‘পূর্ণেন্দুবিকাশ’ ছাপা হয়েছিলো। পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য নামে অন্য একজন কবি আছেন বলে এই ভুল অনেকের পক্ষেই মনস্তর্ষকর হয়েছে। আমরা এ-জগ্জে ক্ষুণ্ণিত।

অমিয় চক্রবর্তীর ‘আন্তর্জাতিক’ কবিতার অষ্টম পংক্তিতে ‘দাঁড়ালো’র বদলে ‘দাঁড়াই’ পড়তে হবে। —সম্পাদক

## KAVITA

( Poetry )

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or \$ 1. 50

Rupee one per copy

এক টাকা

Published quarterly at Kavita Bhavan, 202 Rashbehari Avenue,

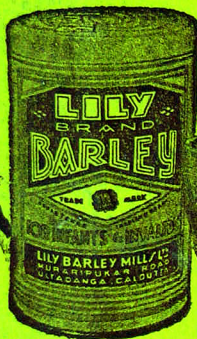
Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE

Assistant Editor : NARESH GUHA



আদর্শ পথ  
পানীয় ও খাদ্য



লিলি  
বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ  
প্রাকৃতিক

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত  
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩